বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্প্রসারিত তথ্য ও প্রযুক্তি

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. রফিকুল হায়দার

ড. মো. খায়রুল আলম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

চট্টগ্রাম

২০২০ খ্রি.

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্প্রসারিত তথ্য ও প্রযুক্তি

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. রফিকুল হায়দার

ড. মো. খায়রুল আলম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

চট্টগ্রাম

২০২০ খ্রি.

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্প্রসারিত তথ্য ও প্রযুক্তি

কপি রাইট
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম-৪১১২
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৮৩৪৪-৭
প্রকাশ কাল: জুন, ২০২০ খ্রি.

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর
পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোন
অংশ কোন মাধ্যমে পূণ: মুদ্রণ বা
ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্রণে: রিমিনি ইন্টারন্যাশনাল
২৯১/বি, ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০ থেকে মুদ্রিত।
মোবাইল: ০১৮১৯ ২০১৬৫৮

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) ১৯৫৫ সালে **"ফরেষ্ট প্রডাক্ট ল্যাবরেটরি"** নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৮ সালে। সৃষ্টিলগ্নে এর দায়িত্ব ছিল কাঠের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন। ১৯৬৮ সালে বন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে এটাকে একটি পূর্ণাঙ্গ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়।

দেশের বনজ সম্পদের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যকার ব্যবধান কমানো এবং বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের সকল গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ শীর্ষক দুটি উইং এর আওতায় ১৭টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে প্রায়োগিক ও অভিযোজিত আঙ্গিকে পরিচালিত হচ্ছে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে উন্নত জাত ও গুনগত মান সম্পন্ন প্ল্যান্টিং মেটেরিয়াল (বীজ, চারা ইত্যাদি) উৎপাদন, বাঁশ, বেত, পাটিপাতা ও অন্যান্য অকাষ্ঠল বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা; সামাজিক বনায়ন ও সুষ্ঠু খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি; বৃক্ষ প্রজনন ও উন্নয়ন; বন ব্যবস্থাপনা ও বন বাগান উত্তোলন পদ্ধতি; জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ; বনজ সম্পদের ইনভেন্টরি, বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হার নিরূপণ; বন মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা; বন-ব্যাধি ও কীট-পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা; বনজ সম্পদের ভৌত ও রাসায়নিক ব্যবহার এবং বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও উদ্ভাবন বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা পরিচালনা করছে। এ যাবৎ প্রতিষ্ঠানটি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ তথ্য সম্ভার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ভাবিত কিছু প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ভোক্তা সংস্থা সহ ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া ইনস্টিটিউট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বনজ সম্পদের উৎপাদন; ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে।

কিন্তু প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য অত্র ইনস্টিটিউটের নির্দিষ্ট কোন সাংগঠনিক কাঠামো বা জনবল নাই। বিজ্ঞানীরাই এ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের পূর্বে প্রচার ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কোন আর্থিক বরাদ্দও ছিল না। ফলে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও তথ্য সমূহ আশানুরূপভাবে জনগনের দোরগোড়ায় পৌছানো সম্ভব হয়নি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৫-০৬ সাল হতে প্রচার খাতে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করায় বিএফআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ জন মানুষের কাছে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ প্রচার কার্যক্রমের একটি বড় অনুষঙ্গ হলো তথ্য ভিত্তিক ফ্যাক্টশিট মুদ্রণ ও প্রচার। ফ্যাক্টশিট ভিত্তিক এসব খন্ড খন্ড তথ্যকে নিয়ে সমন্বিত ভাবে **"বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সম্প্রসারিত তথ্য ও প্রযুক্তি"** শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশের প্রয়াস কে আমি সাধুবাদ জানাই। এই গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত তথ্য ভোক্তাদের উপকারে আসবে এবং বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারে ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সাধারণ ভোক্তাদের চাহিদার নিরিখে এইরূপ একটি গ্রন্থ রচনা, সংকলন ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি এ প্রকাশনার সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

ড. মো. মাসুদুর রহমান
পরিচালক
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন এ প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর চট্টগ্রাম শহরের ষোলশহরে অবস্থিত। ১৯৫৫ সালে বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে "ফরেষ্ট প্রডাক্ট ল্যাবরেটরি" নামে চট্টগ্রামে এ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বনজ সম্পদ গবেষণার পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে বিএফআরআই-কে একটি পূর্নাঙ্গ জাতীয় বন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়।

বিএফআরআই প্রধানত বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বন ও বনজ সম্পদ সম্পর্কিত সমস্যা সমূহের সমাধানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বনজ সম্পদের চাহিদাও সরবরাহের মধ্যকার ব্যবধান কমানো এবং বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সকল গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালিত।

বর্তমানে ১৭টি গবেষণা বিভাগের অধীনে ১২টি প্রোগ্রাম এরিয়ায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত অত্র ইনস্টিটিউট ৫০টির অধিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারিগরি ও মৌলিক তথ্য সম্ভার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকাশ করেছে প্রায় ১২০০ টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। বিশটিরও অধিক প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য বিএফআরআই এর কোন সাংগঠনিক অবকাঠামো বা জনবল নাই। বিভিন্ন বিভাগের জনবলের সমন্বয়ে প্রচার ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম চলছে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের পূর্বে প্রচার ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কোন নির্দিষ্ট আর্থিক বরাদ্দ ছিলনা। ফলে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ আশানুরূপ ভাবে জনগণের দোর-গোড়ায় পৌছানো সম্ভব হয়নি। বিগত ২০০৫-০৬ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচার খাতে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করায় বিএফআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহ জনগনের মাঝে প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রতীয়মান হয় যে ইংরেজিতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সমূহ সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য নয়। তারই আলোকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও তথ্য সমুহকে সহজবোধ্য আকারে প্রকাশের নিমিত্তে বাংলায় প্রযুক্তি ফ্যাক্টশিট রূপে (লিফলেট, ফোল্ডার ইত্যাদি) প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছে Swiss Development Corporation (SDC) এর সহায়তায় পরিচালিত গ্রাম ও খামার বনায়ন প্রকল্প। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সাল হতে এ পর্যন্ত যে সব তথ্য উপাত্ত প্রযুক্তি ফ্যাক্টশিট আকারে মুদ্রণ করত মানুষে দোর-গোড়ায় কিছুটা হলেও নেওয়া সম্ভব হয়েছে, সেসব তথ্যের সমন্বয়ে এই গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খন্ড খন্ড ফ্যাক্টশিট বা তথ্যকে সমন্বিতভাবে একত্রে নিয়ে আসার প্রয়াসে এ গ্রন্থটি সংকলন করা হয়েছে, যাতে সাধারণ ভোক্তাগোষ্ঠী এক সাথে অনেক তথ্য সহজে পেতে পারে।

এ গ্রন্থে প্রযুক্তি ভিত্তিক সন্নিবেশিত তথ্য সমূহ অত্র প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গবেষণা লব্ধ উদ্ভাবনের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থিত। যে সব প্রকাশনার উপর ভিত্তি করে উক্ত গ্রন্থটি সংকলন করা হয়েছে সেগুলো উক্ত গ্রন্থটির পিছনের অংশে তথ্যপঞ্জিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে সব বিভাগ বা বিজ্ঞানী তথ্য সমূহ গ্রন্থনে সহযোগিতা করেছে সে সব বিভাগ বা বিজ্ঞানীর নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি SDC এর গ্রাম ও খামার বনায়ন প্রকল্পের প্রতি আমাদের এরূপ প্রয়াসে সহযোগিতা করার জন্য। টাইপিং এবং ডিজাইনের কাজে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই মোঃ মাহমুদুল হাসান, কম্পিউটার অপারেটরকে। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আরন্যক ফাউন্ডেশন (Arannayk Foundation), ঢাকার প্রতি তাদের সহযোগিতার জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর ড. কামাল হোসাইনকে এ পান্ডুলিপি উৎকর্ষ সাধনে সহযোগীতার জন্য। সার্বিক সহযোগিতা ও মুখবন্ধ লিখে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করলেন বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মো: মাসুদুর রহমান। প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিট এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য জানাই আন্তরিক মোবারক বাদ।

ড. রফিকুল হায়দার
ড. মো. খায়রুল আলম

সুচিপত্র

মুখবন্ধ	III
প্রারম্ভিক কথা	IV
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিচিতি	০১
ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	০১
সাংগঠনিক অবকাঠামো	০১
কার্যক্রম	০২
গবেষণা কার্যক্রমের আওতা	০২
প্রতিষ্ঠানের অর্জিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য	০৩
প্রদত্ত কারিগরি সহায়তা	০৩
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	০৪
প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ	০৪

বন ব্যবস্থাপনা উইং এর আওতায় বিভাগ ভিত্তিক তথ্য ও প্রযুক্তি সমূহ

বীজ বাগান বিভাগ	০৯
বৃক্ষ বীজ সংরক্ষণ ও গুদামজাত করণ	০৯
মাতৃ বৃক্ষ (প্লাস ট্রি) নির্বাচন ও বৃক্ষ উন্নয়ন	১১
অঙ্গজ উপায়ে হাইব্রিড একাশিয়ার বংশ বিস্তার	২৪
সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	২৭
কোথায় কি গাছ লাগাবেন	২৭
বৃক্ষের চারা রোপণ ও পরিচর্যা	৩০
কৃষি জমির আইলে বৃক্ষ রোপণ	৩২
মূলী বাঁশের ফল বা বীজ সংগ্রহ ও রোপণ পদ্ধতি	৩৫
বাঁশের কোঁড়ল একটি সুস্বাদু খাবার	৩৭
পাহাড়ি অঞ্চলের অর্থকরি পণ্য ফুল ঝাড়ুর চাষাবাদ	৩৯
সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	৪২
কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ	৪২
বাঁশঝাড় ব্যবস্থাপনা	৪৪
তালের চারা উত্তোলন ও রোপণ পদ্ধতি	৪৬
টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উৎপাদন কৌশল	৪৯
গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	৫২
বেতের চারা উৎপাদন, চাষ ও ব্যবহার	৫২
পাটিপাতার চাষ পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব	৫৬
ভেষজ উদ্ভিদের ক্ষুদ্র বীজ হতে চারা উত্তোলন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা	৬১

ভেষজ উদ্ভিদ শিমূল এর চাষ পদ্ধতি ও ব্যবহার ৬৪
ভেষজ উদ্ভিদ বাসক এর চাষ পদ্ধতি ও ব্যবহার ৬৮
ভেষজ উদ্ভিদ শতমূলী এর চাষ পদ্ধতি ও ব্যবহার ৭১
ভেষজ উদ্ভিদ অশ্বগন্ধা এর চাষ পদ্ধতি ও ব্যবহার ৭৫
ভেষজ উদ্ভিদ কালো তুলসির চারা উৎপাদন, চাষ ও ব্যবহার ৭৯
ভেষজ উদ্ভিদ কালোমেঘের চারা উৎপাদন, চাষ ও ব্যবহার ৮৩
আগর চাষ পদ্ধতি ৮৭
ধুপের নার্সারি উত্তোলন কৌশল ও সংরক্ষণ ৯২

মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ৯৫
পাহাড়ি ভূমি চাষাবাদে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ বেষ্টনী প্রযুক্তি বা ন্যাচারাল ভেজিটেটিভ (এনভিএস) পদ্ধতি ৯৫
বৃক্ষরোপণে পরিবেশ বান্ধব ও অর্থ সাশ্রয়ী অগার হোল প্রযুক্তির ব্যবহার ৯৮

বন রক্ষণ বিভাগ ১০০
নার্সারির বনজ চারার পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই এবং ব্যবস্থাপনা

পোকা-মাকড় ১০০
মেহগনির ডগা ছিদ্রকারী পোকা ও তার প্রতিকার ১০০
কাঠ বাদামের পাতাভোজী পোকা ও তার ব্যবস্থাপনা ১০২
অর্জুন গাছের পাতার গল পোকার আক্রমণ ও তার প্রতিকার ১০৩
কড়ই এর পাতাভোজী পোকা ও তার ব্যবস্থাপনা ১০৪
নিমের রস শোষক বা মশক বাগ ও তার প্রতিকার ১০৫
বিভিন্ন বৃক্ষের বাকলভোজী পাতার আক্রমণ ও প্রতিকার ১০৬
ইপিল-ইপিলে সাইলিড পোকার আক্রমণ ও ব্যবস্থাপনা ১০৮
উঁড়চঙ্গা ও তার প্রতিকার ১০৯
আকাশমনির ক্ষুদে মাকড় ও তার নিয়ন্ত্রণ ১১০
সজিনার কান্ড ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ ও নিয়ন্ত্রণ ১১১
সেগুনের পাতাভোজী পোকা ও তার প্রতিকার ১১৩
ঘুণ পোকার আক্রমণ ও তার প্রতিকার ১১৫
উঁই পোকার আক্রমণ ও তার নিয়ন্ত্রণ ১১৭

রোগ-বালাই ১১৯
নার্সারিতে চারার ঢলে পড়া রোগ ও ব্যবস্থাপনা ১১৯
চারার শিকড় পঁচন রোগ ও ব্যবস্থাপনা ১২১
হাইব্রিড একাশিয়া চারার পাউডারি মিলডিউ রোগ ও প্রতিকার ১২২
ইউক্যালিপ্টাস চারার আগা মরা রোগ ও তার প্রতিকার ১২২
বেতের পাতায় দাগপড়া রোগ ও তার প্রতিকার ১২৩
নিমের পাতায় দাগ পড়া রোগ ও তার প্রতিকার ১২৩
বাঁশের মড়ক দমন ব্যবস্থা ১২৪
শিশু গাছের মড়ক ও তার প্রতিকার ১২৬
অশ্বগন্ধার রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা ১২৯
চুইঝালের রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা ১৩২

ঘৃত কাঞ্চনের রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা ১৩৫
বাসকের রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা ১৩৮
তুলসির রোগ ও তার ব্যবস্থাপনা ১৪০
বনাঞ্চলে মৌমাছি পালন ১৪২

বন ইনভেন্টরি বিভাগ ১৪৭
বনজ উদ্ভিদ প্রজাতির বৃদ্ধি এবং ফলন মডেল ১৪৭
সহজ পদ্ধতিতে রাবার কাঠের পরিমাণ নির্ণয় ১৫০
সুন্দরবনের ৬টি গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের ব্যাসের বর্ধনহার নির্ণয় ১৫২

বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ ১৫৩
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঠ শনাক্তকরণ ১৫৩
হারবেরিয়াম বা উদ্ভিদ সংগ্রহশালা ১৫৫
জাইলেরিয়াম বা কাষ্ঠ সংগ্রহশালা ১৫৭
বাংলাদেশের বৃক্ষরাজি ১৫৯
বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে জন্মানো উপযোগী বৃক্ষসমূহ ১৬০

প্ল্যান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ ১৬১
বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রতিষ্ঠিত কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বাগান উত্তোলন কৌশল ১৬১
উপকূলীয় এলাকার উঁচু ভূমিতে মূলভূমির বৃক্ষ প্রজাতির বাগান উত্তোলন পদ্ধতি ১৬৪
বাংলাদেশের উপকূলীয় বসতবাড়িতে কৃষি-বনায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন কৌশল ১৬৭
বাংলাদেশের উপকূলীয় বসতবাড়িতে বাঁশের বংশ বিস্তার ও চাষ পদ্ধতি ১৭০
বাংলাদেশের উপকূলীয় বসতবাড়িতে বেত চাষ পদ্ধতি ১৭৩

ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ ১৭৭
ম্যানগ্রোভ প্রজাতির নার্সারি উত্তোলন কৌশল ১৭৭
গোলপাতার নার্সারি ও বাগান উত্তোলন কৌশল ১৮৯
জলবায়ুর পরিবর্তন তথা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভাব মোকাবেলায় আইলা দূর্গত এলাকায় বেড়ী বাঁধে নির্বাচিত প্রজাতির পরিকল্পিত বনায়ন কৌশল ১৯৩
সুন্দরবনে খলসি প্রজাতির বনায়ন কৌশল ১৯৭

বনজ সম্পদ উইং এর আওতায় বিভাগ ভিত্তিক তথ্য ও প্রযুক্তি সমূহ

কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগ ২০৩
রাসায়নিক সংরক্ষণী প্রয়োগে আসবাব ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত কাঠ ও বাঁশের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ২০৩
পান বরজে ব্যবহারিত বাঁশের শলা, খুঁটি, কাইম ও ছনের ব্যবহারিক আয়ুস্কাল বৃদ্ধি ২০৬

কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ ২০৮
বাঁশের যোজিত পণ্য (কম্পোজিট প্রোডাক্টস) ২০৮
গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে সিমেন্ট বন্ডেড পার্টিকেল বোর্ড ২১০

কাষ্ঠ শুস্কিকরণ ও শক্তি নিরূপণ বিভাগ ২১২
সৌর কিল্ন কাঠ সিজন করার একটি সুলভ ও সহজ পদ্ধতি ২১২

কাষ্ঠ কারিগরী ও প্রকৌশল বিভাগ ২১৬
আসবাব ও গৃহ নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে রাবার কাঠের ব্যবহার ২১৬
বন রসায়ন বিভাগ ২১৮
আগর কাঠ হতে আগর তেল নিষ্কাশনে প্রচলিত পদ্ধতির উন্নয়ন ২১৮
মন্ড ও কাগজ বিভাগ ২২০
দেশীয় প্রজাতির গাছ হতে মন্ডের উৎপাদন হার ও গুনগত মান বাড়ানোর প্রযুক্তি ২২০
তথ্যপঞ্জি ২২১
পরিশিষ্ট-১: উদ্ভিদের স্থানীয় নাম ও বৈজ্ঞানিক নামের তালিকা ২২৭
পরিশিষ্ট-২: কাঠ জাতীয় গাছের বীজের তথ্যপঞ্জি ২৩১

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিচিতি

ভূমিকা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালে বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে "ফরেস্ট প্রডাক্ট ল্যাবরেটরি" নামে চট্টগ্রামে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির প্রেক্ষিতে বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে ১৯৬৮ সালে এটিকে বন বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৫ সাল থেকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর জীববৈচিত্র্যে ভরপুর সবুজ পাহাড় ঘেরা মনোরম পরিবেশে চট্টগ্রাম মহানগরীর ষোলশহরে ২৮ হেক্টর জমির উপর অবস্থিত।

ভিশন

বাংলাদেশের বন ও বনজ সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন।

মিশন

দেশের বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা পরিচালনা করা এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ভোক্তা জনগোষ্ঠিকে পরিজ্ঞাতকরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা।

২. বন্যপ্রাণীসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা।

৩. বাঁশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অন্যান্য অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা।

৪. প্রাকৃতিক ও সৃজিত ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উপকূলীয় ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে গবেষণা।

৫. কাঠ ও অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাণিজ্যিক পণ্য উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা।

৬. বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ-পর্যায়ে ভোক্তাগোষ্ঠীকে পরিজ্ঞাতকরণ।

সাংগঠনিক অবকাঠামো

প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর অধীনে নিম্নোক্ত ১৭টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

বন ব্যবস্থাপনা উইং

১. মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ
২. বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ
৩. বীজ বাগান বিভাগ
৪. সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ
৫. সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ
৬. গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ
৭. ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ
৮. প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ
৯. বন রক্ষণ বিভাগ
১০. বন ইনভেন্টরি বিভাগ
১১. বন অর্থনীতি বিভাগ

বনজ সম্পদ উইং

১. কাষ্ঠ কারিগরি ও প্রকৌশল বিভাগ
২. কাষ্ঠ শুষ্কিকরণ ও শক্তি নিরূপণ বিভাগ
৩. কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগ
৪. মন্ড ও কাগজ বিভাগ
৫. কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ
৬. বন রসায়ন বিভাগ

এছাড়াও বন্যপ্রাণি পরিশাখার অধীনে বন্যপ্রাণি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গবেষণা বিভাগসমূহ ছাড়াও প্রশাসন বিভাগ ও মেরামত প্রকৌশল বিভাগ সার্বিক প্রশাসনিক ও সেবা প্রদান করে থাকে।

কার্যক্রম

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যাবলী হল বন বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা পরিচালনা। বর্তমানে বিএফআরআই নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করছে ঃ

১. বনায়নের সার্বিক উন্নতির জন্য পাহাড়ি ও সমতল এলাকার বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা।
২. জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণের লক্ষ্যে তথ্য ও উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৩. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ কাঠ, বাঁশ ও বেতজাত শিল্পের কাঁচামালের সরবরাহ, বহুমুখী ব্যবহার ও অপচয় রোধে গবেষণার মাধ্যমে উন্নত/ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৪. ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, ভূমিহীন ও দরিদ্র নারী গোষ্ঠী এবং কৃষি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে কৃষি-বনায়ন গবেষণা, লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি জোরদারকরণ ও উৎপাদনের মডেল সৃষ্টি।
৫. প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় বন সৃষ্টি এবং উপকূলীয় ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৬. উদ্ভাবিত তথ্য ও প্রযুক্তিসমূহ বিভিন্ন ভোক্তা সংস্থা বা ব্যক্তি পর্যায়ে সম্প্রসারণ।

গবেষণা কার্যক্রমের আওতা

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে ঃ

১. উন্নত জাত ও গুণগত মান সম্পন্ন প্লান্টিং মেটিরিয়াল (বীজ, চারা ইত্যাদি) উৎপাদন।
২. বন ব্যবস্থাপনা ও বাগান উত্তোলন পদ্ধতি।
৩. বৃক্ষ প্রজনন ও উন্নয়ন।
৪. বাঁশ, বেত, ভেষজ উদ্ভিদ ও অন্যান্য অকাষ্ঠল বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা।
৫. জীববৈচিত্র্য ও তার সংরক্ষণ।
৬. বনজ সম্পদের ইনভেনটরি, বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হার নিরূপণ।
৭. বন-মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা।

৮. সামাজিক বনায়ন ও কৃষি বনায়ন বিষয়ক গবেষণা।
৯. উদ্ভিদ রোগসমূহ ও কীঠ-পতঙ্গ দমন।
১০. বনজ সম্পদের ভৌত ব্যবহার।
১১. বনজ সম্পদের রাসায়নিক ব্যবহার।
১২. প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।

প্রতিষ্ঠানের অর্জিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য

১. উন্নতমানের বীজ ও চারা উৎপাদন।
২. ভূমির উপযোগিতা অনুযায়ী বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন।
৩. কঞ্চি-কলম ও টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ।
৪. নার্সারি ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রজাতির চারায় সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ।
৫. বীজতলা ও বনজ বৃক্ষের পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।
৬. চারা উত্তোলন পদ্ধতি ও অঞ্চল উপযোগী প্রজাতি নির্বাচন।
৭. জ্বালানী কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কপিস ব্যবস্থাপনা ও এর আবর্তন পদ্ধতি।
৮. ভেষজ উদ্ভিদের চাষ ও সংরক্ষণ।
৯. পাহাড়ি ভূমিতে চাষাবাদের বিকল্প ও লাগসই প্রযুক্তি।
১০. বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য।
১১. সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চলের উঁচু এলাকায় মূল ভূমির বৃক্ষ প্রজাতির বাগান সৃষ্টি।
১২. গোলপাতার নার্সারি ও বাগান উত্তোলন কৌশল।
১৩. গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির নার্সারি ও বাগান উত্তোলন কৌশল।
১৪. বনজ বৃক্ষের বায়োমাস, বর্ধনহার ও উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয়।
১৫. স্বল্প শ্রমে ও স্বল্প খরচে বৃক্ষ চারা রোপণের সহজ পদ্ধতি।
১৬. বেত ও পাটিপাতার চারা ও বাগান উত্তোলন পদ্ধতি।
১৭. বন ও বনজ সম্পদ বিষয়ক তথ্য/পরিসংখ্যান পুস্তিকা সংকলন।
১৮. গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষপ্রজাতি সমূহের সর্বোত্তম আর্থিক বিশ্লেষণ ও আবর্তনকাল নির্ধারণ।
১৯. সৌর শক্তির সাহায্যে কাঠ শুষ্কিকরন।
২০. রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে গ্রামীণ বসতবাড়ির নির্মাণসামগ্রী এবং বাঁশ ও বেতের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি।
২১. রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে পান বরজের কাঠি ও সবজির মাচায় ব্যবহৃত বাঁশের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি।
২২. অব্যবহৃত কাঠ দ্বারা আকর্ষণীয় দ্রব্য ও পণ্য তৈরির প্রযুক্তি।
২৩. রেলওয়ে স্লীপারে অপ্রচলিত দেশীয় কাঠের ব্যবহার।
২৪. স্বল্প মূল্যে পার্টিকেল বোর্ড তৈরির কৌশল।
২৫. রাবার কাঠ দ্বারা উন্নতমানের আসবাবপত্র প্রস্তুত।
২৬. বাঁশের যোজিত পণ্য তৈরির কৌশল।
২৭. নিম্নমানের পাট থেকে উন্নতমানের মন্ড তৈরি পদ্ধতি।

প্রদত্ত কারিগরি সহায়তা

অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বনজ সম্পদের উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পর্কিত নিম্নোক্ত বিষয়ে পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয় ঃ

১. বৃক্ষ-বীজ পরীক্ষণ, সনদপত্র প্রদান ও বিতরণ।
২. কাঠ, প্লাইউড, পার্টিকেল বোর্ড, কাগজ ও মন্ড এবং উদ্ভিদের নমুনা শনাক্তকরণ।
৩. বৃক্ষের বীজতলা, বাগানের পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই শনাক্তকরণ ও তাদের ব্যবস্থাপনা।
৪. সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকার পানি ও মৃত্তিকার লবণাক্ততা পরীক্ষণ।
৫. মৃত্তিকা পরীক্ষণ ও গাছের পুষ্টি নিরূপণ।
৬. বাঁশের বংশ বিস্তার ও চাষ।
৭. বৃক্ষজাত রাসায়নিক দ্রব্যাদির পরীক্ষণ।
৮. বিশ্ববিদ্যালয়সহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বন ও বনজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণা সহায়তা প্রদান।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে ঃ

১. উন্নতমানের বীজ ও চারা উৎপাদন কৌশল।
২. নার্সারি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা।
৩. ভেষজ উদ্ভিদের চাষ ও ব্যবস্থাপনা।
৪. কঞ্চি-কলম পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উত্তোলন কৌশল।
৫. বাঁশ চাষ, মড়ক দমন ও ঝাড় ব্যবস্থাপনা।
৬. টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বাঁশের চারা উত্তোলন কৌশল।
৭. কাঠের রকমারি দ্রব্য সামগ্রী তৈরির কৌশল।
৮. সঠিকভাবে কাঠ শুষ্কিকরনের কৌশল।
৯. স্বল্প খরচে বাঁশ ও কাঠ এর আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির কৌশল।
১০. বাঁশের যোজিত পণ্য তৈরির কৌশল।
১১. স্বল্প খরচে বাঁশ দিয়ে টাইল্‌স তৈরির কৌশল।
১২. বীজতলা ও বনজ বৃক্ষের পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দমন কৌশল।
১৩. সহজ পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাঠ শনাক্তকরণ।
১৪. মাটির গুনাগুন বিবেচনা করে সঠিক প্রজাতি নির্বাচনের প্রযুক্তি নিরূপণ।

প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য সুবিধাসমূহ

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল বিতরণ ও সম্প্রসারণে বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এই সব সুযোগ-সুবিধা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সকলের জন্য উন্মুক্ত।

১. লাইব্রেরি ও ইহার ব্যবহার ঃ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি দেশে বনবিদ্যা বিষয়ক একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। ইহাতে ১১,৮৩২ বই, বুলেটিন এবং মনোগ্রাফ রয়েছে। এ ছাড়া নিয়মিতভাবে ১২টি স্থানীয় ও ৭৯টি আন্তর্জাতিক জার্নাল/সাময়িকী চাঁদা প্রদান বা প্রকাশনা বিনিময় কর্মসূচির আওতায় পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ ও বিনিময় করা হয়।

২. প্রকাশনা ঃ বিএফআরআই এর গবেষণালব্ধ ফলাফল "বাংলাদেশ জার্নাল অব ফরেস্ট সাইন্স" নামক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বন বিষয়ক জার্নাল এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ থেকে ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত এর ৩৩টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি খন্ডে দুইটি সংখ্যা থাকে। ইহা ছাড়াও গবেষণালব্ধ ফলাফল, বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জার্নাল, বুলেটিন, ওয়ার্কিং পেপার, ফোল্ডার এবং লিফলেট/ প্রচার পত্র আকারেও প্রকাশিত হয়ে থাকে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশনার সংখ্যা প্রায় ১,২০০ টি।

৩. হারবারিয়াম ঃ বিএফআরআই হারবারিয়াম দেশের বনজ উদ্ভিদ নমুনার একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা। উক্ত হারবারিয়ামে প্রায় ৩০,৭০০ টি সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৪. জাইলেরিয়াম ঃ বিএফআরআই জাইলেরিয়াম দেশের একমাত্র কাঠের সংগ্রহশালা। উক্ত জাইলেরিয়াম ৬০৬টি দেশীয় প্রজাতির ও ১,৯৩২টি বিদেশি কাঠের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৫. আরবোরেটাম ঃ বিএফআরআই আরবোরেটামে এ প্রর্যন্ত ৮৪টি দেশি, ২৯টি বিদেশি বৃক্ষ প্রজাতি এবং ১০টি বেত প্রজাতি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও ২৫০ প্রজাতির ঔষধি বীরুৎ, গুল্ম ও বৃক্ষ প্রজাতি সমন্বয়ে এই আরবোরেটাম সমৃদ্ধ।

৬. ব্যাম্বুসেটাম (বাঁশ বাগান) ঃ বিএফআরআই ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত ব্যাম্বুসেটাম দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ৩৫ প্রজাতির বাঁশের একটি দর্শনীয় বাগান এবং জার্মপ্লাজম সংগ্রহশালা। এ বাগান হতে প্রতি বৎসর বীজ, কঞ্চি-কলম ও টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারা উত্তোলন করে বাঁশ চাষের সম্প্রসারণ করা হয়ে থাকে।

৭. বন কীট-পতঙ্গ ও ছত্রাকের সংগ্রহশালা ঃ দুই হাজার ছত্রাক ও ৬,০০০ কীট-পতঙ্গের নমুনা যথাক্রমে ছত্রাক সংগ্রহশালা ও কীট-পতঙ্গ মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৮. বন্যপ্রাণি জাদুঘর ঃ এখানে রয়েছে বাংলাদেশের বন্যপ্রাণির একটি সংগ্রহশালা। এতে বেশ কিছু দুর্লভ প্রজাতির প্রাণির অবয়ব সংরক্ষিত আছে।

৯. বনতাত্ত্বিক মিউজিয়াম ঃ বিএফআরআই এ রয়েছে কাঠের বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার এবং গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কাজসমূহ প্রদর্শনের একটি বনতাত্ত্বিক মিউজিয়াম।

বন ব্যবস্থাপনা উইং এর আওতায় বিভাগ ভিত্তিক তথ্য ও প্রযুক্তি সমূহ

বীজ বাগান বিভাগ

বৃক্ষ বীজ সংরক্ষণ ও গুদামজাত করণ

বীজ সংরক্ষণ বলতে আমরা বুঝি বীজ গজানোর গুনাবলী অপরিবর্তিত রেখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য বীজের আয়ুষ্কাল বজায় রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা।

বীজ সংরক্ষণ কেন করবেন

১. চারা উৎপাদন করার মৌসুমে নির্দিষ্ট আকারের প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা উৎপন্ন করার লক্ষ্যে পরিমাণ মত বীজ এর সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য।
২. পোকা-মাকড় ও বৈরী পরিবেশ থেকে বীজকে রক্ষার জন্য।
৩. প্রতি বছর সব বৃক্ষে একই পরিমাণ বীজ উৎপন্ন হয় না। তাই বীজ অজন্মার বছর (bad seed year) বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য।
৪. অনেক সময় বীজের সুপ্ত অবস্থা ভাঙ্গার জন্যও বীজ গুদামজাত করা হয়।

বীজের আয়ুষ্কাল

আয়ুষ্কালের ভিত্তিতে বীজকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

স্বল্পজীবি বীজ ঃ যে সমস্ত বীজ গাছ থেকে সংগ্রহ করার বা ঝরে পড়ার পর দ্রুত অংকুরোদগম ক্ষমতা লোপ পায় তাকে স্বল্পজীবি বীজ বলে। এ সমস্ত বীজ সাধারণতঃ অধিকাংশই রসালো এবং সহজে গুদামজাত করা যায় না। তাই সংগ্রহ করার পর যত দ্রুত সম্ভব এ জাতীয় বীজ বপন করা দরকার। নিম, শাল, চম্পা, গর্জন, আগর, তেলশুর, চাঁপালিশ, ঢাকিজাম স্বল্পজীবি বীজের উদাহরণ।

দীর্ঘজীবি বীজ ঃ এ সমস্ত বীজ সাধারণতঃ কঠিন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে এবং ভালোভাবে শুকানোর পর অনুকুল পরিবেশে সংরক্ষণ করলে অংকুরোদগম ক্ষমতা অনেক দিন পর্যন্ত বজায় থাকে। শীলকড়ই, সেগুন, গামার, লোহাকাঠ ইত্যাদি দীর্ঘজীবি বীজের উদাহরণ।

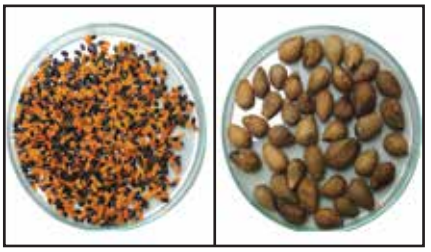

বীজ সংরক্ষণের সময় কাল

স্বল্পমেয়াদী সংরক্ষণ ঃ এ ধরণের সংরক্ষণ সাধারণতঃ অনধিক এক বছরের (বীজ সংগ্রহ হইতে পরবর্তী বীজ বপন মৌসুম পর্যন্ত) জন্য করা হয়। কৃষক ও নার্সারি মালিকগণ সাধারণতঃ চট বা কাপড়ের বস্তা, পলিথিন ব্যাগ, মাটির পাত্র ও ড্রামে এ ধরণের সংরক্ষণ করে থাকেন।

দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ ঃ এ ধরণের সংরক্ষণ এক বছরের অধিক সময়ের জন্য করা হয়ে থাকে। এবং সংরক্ষণ সাধারণতঃ হিমাগারে বা ফ্রিজে করা হয়। জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

বীজ সংগ্রহ ও বাছাইকরণ

বীজ সংরক্ষণ ও গুদামজাত করার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে :

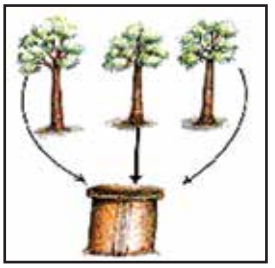

১. সুস্থ, সবল ও নিরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে একত্রে মিশাতে হবে
২. লক্ষ্য রাখতে হবে বীজ বা ফলের খোসা যেন বীজের গায়ে লেগে না থাকে
৩. অপুষ্ট ও ভাঙ্গা বীজ এবং ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি বাছাই করে ফেলতে হবে
৪. রোগাক্রান্ত বা পোকা-মাকড় যুক্ত বীজ থাকলে তা আলাদা করে ফেলতে হবে
৫. বাছাই করা বীজ রোদে ভাল ভাবে দুই-তিন দিন শুকাতে হবে যাতে বীজে জলীয় ভাগের পরিমাণ শতকরা ৮-১০ ভাগ থাকে
৬. বীজের পরিমাণের উপর নির্ভর করে সংরক্ষণ পাত্র নির্বাচন করুন
৭. সংরক্ষণ পাত্রের গায়ে লেবেল দ্বারা বীজের নাম, উৎস ও সংগ্রহের তারিখ লিখে রাখুন

বীজ কোথায় সংরক্ষণ করবেন

১. বীজ সংগ্রহের পাত্র সব সময় পরিষ্কার ও শুকনা হতে হবে
২. বীজের পরিমাণ কম হলে ঢাকনাযুক্ত টিনের কৌটা, ছিপিযুক্ত অস্বচ্ছ কাঁচের বোতল বা প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। খোলা পাত্রে কোন অবস্থাতেই বীজ রাখা উচিত নয়
৩. পাত্রের তুলনায় বীজ কম হলে পাত্রের উপরস্থ খালি জায়গা ছাই, কাগজ অথবা কাঠকয়লা দিয়ে পূর্ণ করে দিন
৪. বীজের পরিমাণ বেশি হলে ঢাকনাযুক্ত ড্রাম, মাটির বড় পাত্র কিংবা পলিথিন ব্যাগযুক্ত চটের বস্তা ব্যবহার করুন
৫. বীজ অথবা বীজ ভর্তি পাত্র কোন অবস্থাতেই স্যাঁতসেঁতে জায়গায় রাখা উচিত নয়
৬. পাত্র যে রকম হউক না কেন তাহা মেঝেতে না রেখে কিছুটা উঁচু পাটাতনে রাখুন
৭. সরাসরি আলো প্রবেশ করে না এবং বায়ু চলাচল করে এমন জায়গায় বীজপাত্রে বীজ সংরক্ষণ করুন
৮. ইঁদুর বা অন্য কোন প্রকার প্রাণী যাতে বীজের কোন ক্ষতি করতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

গুদামজাতকালীন সময়ে ছত্রাক বা পোকা-মাকড়ের আক্রমণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ

১. বীজ সংরক্ষণের সময় বীজের সাথে নিম, নিশিন্দা, তামাক, বিষকাটালি গাছের শুকনো পাতা, পাট বীজের গুড়া বা ন্যাপথলিন রেখে দিন
২. প্রতি কেজি বীজে ১-২ চামচ নিম, বাদাম বা ভেরেন্ডার তেল দিয়ে বীজের উপরিভাগে মাখিয়ে সংরক্ষণ করুন
৩. সংরক্ষণের পূর্বে এক লিটার পানিতে এক মিলিলিটার সুমিথিয়ন ৫০ইসি বা লিমিথিয়ন ৫০ইসি জাতীয় কীটনাশক হালকাভাবে স্প্রে করুন
৪. কড়ই জাতীয় বীজ দানাদার কীটনাশক এবং ছাই মিশিয়ে সংরক্ষণ করুন
৫. বর্ষাকালে সংরক্ষণ করা বীজ রোদে দিন এবং পোকা অথবা ছত্রাক আক্রান্ত কোন বীজ দেখলে তাহা সাথে সাথে আলাদা করে ফেলুন

কাঠ জাতীয় গাছের বীজের একটি তথ্যপঞ্জী পরিশিষ্ট-২ এ সন্নিবেশিত হলো।

সুস্থ সবল চারার জন্য চাই পুষ্টি ও নিরোগ বীজ

মাতৃ বৃক্ষ (প্লাস ট্রি) নির্বাচন ও বৃক্ষ উন্নয়ন

ভূমিকা

বৃক্ষ উন্নয়ন একটি প্রয়োগিক বিদ্যা বা কৌশল যা দ্বারা কোন বৃক্ষ প্রজাতির বংশগত গুণাগুণের পরিবর্তন এনে বা অপরিবর্তিত রেখে মানুষের ব্যবহারের জন্য আরো অর্থবহ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দুইটি জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে একটি অধিক ফলনশীল, রোগ প্রতিরোধী নতুন জাত তৈরি করা যায়। বৃক্ষ উন্নয়ন বিষয়ক অভিজ্ঞতা মানুষের খুব বেশি দিনের নয় এবং আমাদের দেশে এ কাজ আরম্ভ হয়েছে ঊনিশের সত্তর দশকে। দীর্ঘ মেয়াদি বৃক্ষ প্রজাতির সাধারণতঃ ৮-১০ বছরের আগে ফুল ও ফল হয়না বিধায় বংশগত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এর উন্নয়ন করা অনেকটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কেবলমাত্র বংশ পরম্পরায় ধীরে ধীরে এর উন্নয়ন সম্ভব। যেমন বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত মেহগনি প্রজাতির ১০ বা ততোধিক ভাল গুণসম্পন্ন গাছ নির্বাচন করে তা থেকে বীজ নিয়ে বাগান সৃজন করে পূর্বের চেয়ে ২০ ভাগ কাঠের উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। এরূপ বাগান থেকে পুনরায় ভাল গুণাগুণসম্পন্ন বীজ মিশিয়ে ব্যবহার করে বাগান করলে পূর্বের বাগানের চেয়ে আরো ২০ ভাগ কাঠের উৎপাদন বেশি হতে পারে।

বৃক্ষ উন্নয়ন মূলক গবেষণা কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন অধিক সময়, প্রচুর কারিগরি শ্রম ও অর্থ এবং প্রচুর জমি। যেহেতু বংশ পরম্পরায় ধীরে ধীরে বৃক্ষোন্নয়ন করা হয়ে থাকে এজন্য কাঙ্খিত সফলতার জন্য বৃক্ষোন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য বৃক্ষ উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা কঠিন হলেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা আমাদের দেশের সরকারি বনভূমি এখন প্রায় বৃক্ষশূণ্য। নানা কারণে এ সরকারি বনভূমির পরিমাণ ও দ্রুত কমে যাচ্ছে। কাজেই বৃক্ষ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। কয়েক দশক আগে সরকারি বনভূমিতে উৎপাদিত কাঠ ও জ্বালানী দেশের চাহিদা মেটাতে পারত। বসতবাড়ির চারিধারে, অনুর্বর জমিতে ও ফসলের ক্ষেতের আইলে কৃষকেরা এখন প্রচুর গাছ রোপণ করে এবং দেশের প্রয়োজনের অধিকাংশ কাঠ ও জ্বালানী এখন উৎপাদিত হয় গ্রামে। বৃক্ষ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন হলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠিই উপকৃত হবে বেশি। কেননা তারা উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করে অল্প ভূমি থেকে অধিক পরিমাণ কাঠ ও জ্বালানী পেতে পারে। আমাদের দেশে লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে বৃক্ষ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সীমিত বনভূমি থেকে কাঠ ও জ্বালানী কাঠের উৎপাদন বাড়ানো ছাড়া অন্যকোন বিকল্প নাই।

বৃক্ষ উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গুণ ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপন্ন করা, যা দ্বারা অধিক উৎপাদশীল ও উন্নতমানের বৃক্ষ বা বন বাগান সৃজন করা সম্ভব। এখানে বীজ শব্দটি সার্বিক অর্থে বুঝায় ফুলের পুরুষাঙ্গের পরাগরেণূ দ্বারা স্ত্রীঅঙ্গের নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বানু (বীজ) বা গাছের যেকোন অঙ্গ থেকে উৎপাদিত নূতন চারা, যেমন লেবু গাছের শাখা কলম, কাটিং, আলু, পিয়াজ ইত্যাদি বৃক্ষ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

ক. প্রাকৃতিক বন বা সৃজিত বন বাগান থেকে বাহ্যিক গুণগত মানসম্পন্ন গাছ নির্বাচন করে তা থেকে বীজ সংগ্রহ করা।
খ. গুণগত মানসম্পন্ন নির্বাচিত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে তা থেকে চারা বীজ বাগান উত্তোলন করা।
গ. গুণগত মানসম্পন্ন নির্বাচিত গাছ থেকে সায়ন সংগ্রহ করে তা দিয়ে গ্রাফট বা কাটিং করে কলম বীজ বাগান উত্তোলন করা এবং বীজ বাগান থেকে বীজ সংগ্রহ করা।

ঘ. গুণগত মানসম্পন্ন সৃজিত বা প্রাকৃতিক বন বাগান থেকে খারাপ ও রোগাক্রান্ত গাছগুলো অপসারণ করে শুধুমাত্র ভাল গাছগুলো রেখে বীজ উৎপাদন এলাকা রূপান্তর করা।
ঙ. ভাল গুণগত মানসম্পন্ন নির্বাচিত গাছ থেকে সায়ন সংগ্রহ করে তা দিয়ে কাটিং তৈরি করে রোপণ করা।

উপরোল্লিখিত বৃক্ষোন্নয়ন পদ্ধতিগুলো ছাড়াও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত বৃক্ষোন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়

* ভাল গুণগত মানসম্পন্ন নির্বাচিত অনেকগুলো গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে মিশ্রিত বীজ হতে উত্তোলিত চারা দ্বারা বন বাগান সৃজন করা এবং ৮-১০ বছর পর বন বাগানের গাছগুলো বড় হলে অনাকাঙ্খিত গাছ অপসারণ করে বন বাগানকে বীজ উৎপাদন এলাকায় রূপান্তরিত করা।
* পরীক্ষিত বিদেশি প্রজাতির উন্নতমানের বীজ আমদানি করে উত্তোলিত চারা থেকে উডলট সৃজন ও সৃজিত উডলট থেকে অনাকাঙ্খিত গাছ অপসারণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন এলাকায় রূপান্তর করা।

প্লাস ট্রি কি ?

গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য বৃক্ষোন্নয়ন এর যেকোন পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন তার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে প্রাকৃতিক বা সৃজিত বন বাগান থেকে বাহ্যিক গুণাগুণ যাচাই করে ভাল গাছ নির্বাচন করা। চিহ্নিত একটি গাছকে যদি তার বৃদ্ধি, আকৃতি, রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি কাঙ্খিত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা বিবেচনা করে আশেপাশের গাছগুলো থেকে অধিকতর ভাল গুণসম্পন্ন প্রতীয়মান হয় তবে সেই চিহ্নিত গাছটিকে প্লাস ট্রি বলা হয়। তবে মনে রাখতে হবে প্লাসট্রি যেহেতু বাহ্যিক গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ যাচাই করে নির্বাচন করা হয়েছে সেহেতু গাছটি বংশগতভাবে ভাল গুণগত মানসম্পন্ন তা পরীক্ষার পূর্বে নিশ্চিত করে বলা যাবে না। বাহ্যিকভাবে দেখতে ভাল গাছটিকে যাচাই করার পূর্বে যখন চিহ্নিত করা হয় তখন তাকে ক্যানডিডেট ট্রি বা পাত্রগাছ বলা হয়। আশেপাশের যে সমস্ত গাছগুলোর সাথে ক্যানডিডেট ট্রি কে যাচাই করে প্লাস ট্রি নির্বাচন করা হয় তাদেরকে স্যাটেলাইট ট্রি বলা হয়। বৃক্ষোন্নয়নের জন্য নির্বাচিত প্লাস ট্রির বংশগত ভাল গুণাগুণ থাকা বাঞ্চনীয়। এই নির্বাচিত প্লাস ট্রি গুলো থেকে সংগৃহীত বীজ বা সংগৃহীত সায়ন হতে প্রস্তুতকৃত কাটিং দিয়ে প্রোজেনি বা ক্লোনাল ট্রায়ালের মাধ্যমে প্লাস ট্রির বংশগত গুণাগুন যাচাই করা হয়। যে সমস্ত প্লাস ট্রি সংগৃহীত বীজ বা সায়ন হতে উৎপন্ন গাছ প্রোজেনি ট্রায়ালে কাঙ্খিত ফলাফল দেখায় সে সমস্ত গাছগুলোকে 'এলিট ট্রি' বলা হয়।

প্লানটেশন হতে তুলনামূলক যাচাই পদ্ধতিতে প্লাসট্রি নির্বাচন

প্লাস ট্রি নির্বাচনের উদ্দেশ্য

ক) নির্বাচিত প্লাস ট্রি থেকে বীজ সংগ্রহ করে বনায়নে ব্যবহার করলে কাঠের উৎপাদন ২০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়। বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত একটি গাছ যত ভালই হোক না কেন তা থেকে বীজ সংগহ করা উচিত নয়। কমপক্ষে ১০টি নির্বাচিত প্লাস ট্রি থেকে সংগৃহীত বীজ একত্রে মিশিয়ে ব্যবহার করা উচিত। গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে কাঠের উৎপাদন বাড়ানো ছাড়াও রোগ বালাইমুক্ত বাগান সৃজন ও অধিক মানসম্পন্ন কাঠ উৎপাদন সম্ভব।

খ) নির্বাচিত প্লাস ট্রি থেকে বীজ সংগ্রহ করে চারা বীজ বাগান উত্তোলন করা হয়।

গ) নির্বাচিত প্লাস ট্রি থেকে সায়ন (শাখা) সংগ্রহ করে গ্রাফ্‌ট তৈরি করা হয় এবং উক্ত গ্রাফ্‌ট দ্বারা কলম বীজ বাগান উত্তোলন করা হয়। চারা বীজ বাগান ও কলম বীজ বাগান থেকে সংগৃহীত বীজ ব্যবহার করলে উৎপাদন ২০-৪০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। এছাড়া বীজ বাগান থেকে বীজ সংগ্রহ করা অধিকতর সহজ।

প্লাস ট্রি নির্বাচন পদ্ধতির ধারণা

প্রধানত নিম্নলিখিত তিনটি কারণে গাছের বৃদ্ধি ও অন্যান্য গুণাগুণে বাহ্যিকভাবে ভিন্নতা (variation) দেখা যায়ঃ

১. বয়সগত
২. পরিবেশগত
৩. বংশগত

১. বয়সগত ঃ যেকোন জীবিত প্রাণি ও উদ্ভিদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার উচ্চতা ও বেড় বাড়তে থাকে। কোন একটি নির্বাচিত বা চিহ্নিত গাছ পরিবেশগত কারণে ভাল না বংশগত কারণে ভাল তা যাচাই করার জন্য বয়সগত দিক দিয়ে একই রকম এরূপ স্যাটেলাইট ট্রি এর সাথে তুলনা করা হয়। এজন্য প্লাস ট্রি নির্বাচন করার সময় একই বয়সের বাগানের গাছ থেকে আশেপাশে একই প্রজাতির গাছের সাথে তুলনা করে নির্বাচন করতে হয়।

একইরকম পরিবেশে একইপ্রজাতির বিভিন্ন বয়সের গাছ (বয়সগত কারণ)

২. পরিবেশগত ঃ একই বয়সের একই প্রজাতির গাছ পরিবেশগত কারণে বৃদ্ধি ও আকারের দিক থেকে ভিন্ন রকম হতে পারে। পরিবেশগত কারণ বলতে মাটির উর্বরতা, উচ্চতা, লবণাক্ততা, অন্য প্রাণি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, সূর্যালোক ইত্যাদি বুঝায়। তাই নির্বাচিত বা চিহ্নিত গাছটি যে পরিবেশে আছে ঠিক তদ্রুপ পরিবেশের কাছাকাছি স্যাটেলাইট গাছগুলোর সাথে তুলনা করে প্লাস ট্রি নির্বাচন করা হয়।

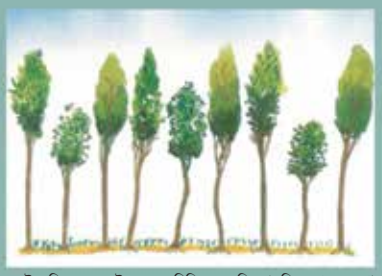

একই পরিবেশে একই বয়সের বিভিন্ন প্রজাতির (পরিবেশগত কারণ)

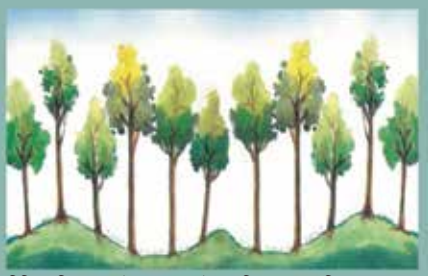

বিভিন্ন পরিবেশে একই বয়সের একই প্রজাতির বাগান (পরিবেশগত কারণ)

৩. বংশগত ঃ অনেক বৃক্ষ প্রজাতি অঙ্গজ বংশবিস্তারের মাধ্যমে নূতন প্রাণের জন্ম দিতে পারে। অঙ্গজ বংশবিস্তারের মাধ্যমে যে নূতন প্রাণের (উদ্ভিদ) সৃষ্টি হয় তাদের বংশগত গুনাগুন একই থাকে। কেননা এই প্রক্রিয়ায় যে নূতন প্রাণের সৃষ্টি হয় প্রকৃতপক্ষে তা তাদের মায়েরই শরীরের অংশ বিশেষ। আবার নতুন প্রাণ ও তাদের মায়ের বংশগত গুনাগুন এক থাকলেও নতুন প্রাণের মধ্যে বয়সগত ও পরিবেশগত কারণে গঠন ও বৃদ্ধির তারতম্য হতে পারে। অধিকাংশ প্রাণি ও উদ্ভিদ যৌন মিলনের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে থাকে। যৌন মিলনের মাধ্যমে বংশবিস্তার হলে নুতন প্রাণসমূহের মধ্যে বা নুতন প্রাণ ও তাদের মাতাপিতার মধ্যে অনেক মিল থাকলেও বংশগত গুনাগুন সম্পূর্ণ ভাবে এক রকম থাকে না। এরূপ পার্থক্যকে বংশগত ভিন্নতা (Genetic variation) বুঝায়। কোন বিশেষ প্রাণি বা উদ্ভিদের বংশগত ভিন্নতা বলতে আমরা তাদের বাহ্যিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো যেমনঃ সাদা-কাল, সোজা-বাঁকা, লম্বা-খাট ইত্যাদিকে বুঝি। একই রকম পরিবেশের একই বয়সের বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বৃদ্ধি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের তারতম্য হতে পারে।

একইরকম পরিবেশে একই প্রজাতির একই বয়সের বাগান (বংশগত কারণ)

উদ্ভিদের গুনাগুনের ভিন্নতার প্রধান কারণগুলো (Sources of variation) উপরে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত কোন একটা কারণ (Source) পৃথকভাবে প্রকৃতিতে কাজ করেনা। উদ্ভিদের যে বাহ্যিক গুনাগুন আমরা দেখতে পাই তা উপরের তিনটি কারণের যৌথ প্রক্রিয়ার ফলাফল।

বংশগত গুনাগুন ট্রায়াল ব্যতিত বাহ্যিকভাবে দেখতে ভাল একটি গাছ কে আমরা কোনভাবেই বলতে পারি না যে গাছটির বংশগত গুনাগুন ভাল। সাধারণতঃ বাহ্যিক গুনাগুন যাচাই করে যখন কোন একটি পাত্র গাছকে প্লাস ট্রি হিসেবে নির্বাচন করা হয় তখন একই বয়সের ও প্রজাতির যারা একই রকম পরিবেশে বড় হয়েছে এরূপ গাছের সাথে তুলনা করে প্লাস ট্রি নির্বাচন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া

হয়, যেহেতু চারাগুলো একই সময়ে রোপণ করা হয়েছে সেহেতু তাদের বয়সগত কারণে বৃদ্ধির তারতম্য হওয়া উচিত নয়। আবার যেহেতু একই পরিবেশে নিবাচিত গাছটি ও স্যাটেলাইট গাছগুলো রোপণ করা হয়েছে সেহেতু পরিবেশগত কারণে তাদের বৃদ্ধি ও আকৃতির তারতম্য বিভিন্ন রকম হওয়া উচিত নয়। অর্থ্যাৎ সহজভাবে বলা যায় বয়সগত, পরিবেশগত কোন প্রভাব নির্বাচিত গাছটির ও স্যাটেলাইট গাছগুলোর মধ্যে নাই। অতএব আমরা নিবাচিত গাছটির যে বাহ্যিক গুনাগুন দেখতে পাই তা তার বংশগত গুনাগুনের জন্য হয়েছে। এক্ষেত্রে বয়স ও পরিবেশগত কোন প্রভাব নাই। নিচের সূত্রের দ্বারা উল্লিখিত ধ্যান ধারণা প্রকাশ করা যায়ঃ

P		G		E
বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	=	বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব	+	পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব
(আমরা যা দেখতে পাই)		(অলক্ষিত বংশগত গুনাগুন)		(পরিবেশগত প্রভাবের ফলাফল)

উপরে উল্লিখিত সুত্রানুয়ায়ী আমরা বলতে পারি যে, যেহেতু নির্বাচিত গাছটি এবং তার চারিধারে স্যাটেলাইট গাছের মধ্যে পরিবেশগত কোন প্রভাব নাই অর্থাৎ পরিবেশগত প্রভাব শূণ্য। সেহেতু নির্বাচিত গাছটির বংশগত গুনাগুনের প্রভাবের কারণে গাছটির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রেঃ

P		G		E
(বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য)	=	(বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব)	+	(পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব)

অর্থ্যাৎ

P		G
(বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য)	=	(বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব)

প্লাস ট্রি নির্বাচন পদ্ধতি

প্লাস ট্রি নির্বাচন করার জন্য একই বয়সের সৃজিত বন বাগান এবং বিদেশি প্রজাতির প্রভিনেন্স ট্রায়াল বাগান খুবই উপযোগী। কেননা এ ধরণের বাগান গুলো একই বছরে লাগানো এবং মোটামুটি একই রকম পরিবেশে সৃজিত। এ ধরণের বাগান থেকে চিহ্নিত পাত্র গাছকে আশেপাশের স্যাটেলাইট ট্রিগুলোর সাথে তুলনামূলক যাচাই (Comparison method) পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। তবে বাগানের গাছগুলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া বাঞ্চনীয়।

প্লাস ট্রি নির্বাচন করার জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলো অবলম্বন করা হয়ঃ

ক. সমস্ত বাগান এলাকাটি ঘুরে দেখে অধিক বৃদ্ধিসম্পন্ন, সোজা ও রোগমুক্ত একটি গাছকে পাত্র গাছ বা ক্যানডিডেট ট্রি হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

খ. চিহ্নিত পাত্র গাছটির চতুর্দিকে ২০ মিটারের মধ্য থেকে ১০টি বড় গাছ ১-১০ পর্যন্ত নাম্বার দিয়ে স্যাটেলাইট ট্রি হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

গ. এবার প্লাস ট্রি রেকর্ড ফরম নিয়ে প্রথম অংশে প্রজাতির নাম, বাগানের অবস্থান ও অন্যান্য তথ্য রেকর্ড করতে হবে।

ঘ. প্লাস ট্রি রেকর্ড ফরমে বর্ণিত অংশে ১০টি স্যাটেলাইট ট্রি এর উচ্চতা, বেড, প্রধান কান্ডের উচ্চতা পরিমাপ করে তাদের গড় মান নির্ণয় করে রেকর্ড করতে হবে।

ঙ. এবার স্যাটেলাইট ট্রির উচ্চতা, বেড ও প্রধান কান্ডের গড় উচ্চতার সহিত তুলনা করে পাত্র গাছটির একই বৈশিষ্ট্যসমূহের স্কোর রেকর্ড করতে হবে। উল্লেখিত স্কোর ছাড়াও পাত্র গাছটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহের স্কোর রেকর্ড করতে হবে। স্কোর দেওয়ার সময় এতদসঙ্গে সংযুক্ত স্কোর পরিমাপের নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে। পাত্র গাছটির স্কোর ১২৫ এর মধ্যে ৯০ এর উপরে হলে তাকে প্লাস ট্রি হিসেবে নির্বাচন করা যাবে।

চ. নির্বাচিত প্লাস ট্রি চিহ্নিত করার জন্য বুক সমান (১.৩ মিটার) উঁচুতে মাঝখানে ৪-৬ ইঞ্চি ফাঁকা রেখে লাল অথবা হলুদ রং দ্বারা ২-৩ ইঞ্চি প্রশস্ত ২টি ব্যান্ড দিতে হবে। দুইটি ব্যান্ডের মধ্যখানে নির্বাচিত গাছটির নাম্বার দিতে হবে।

ছ. নির্বাচিত গাছটিকে যাতে যে কেউ সহজ খুঁজে পেতে পারে সেজন্য স্থানীয় ম্যাপ অনুযায়ী গাছটির অবস্থান রেকর্ড সিটে চিহ্নিত করতে হবে।

জ. সম্ভব হলে গাছের ছবি সংগ্রহ করে ফরমের সহিত সংযুক্ত করতে হবে।

প্লাস ট্রি নির্বাচনে বিবেচ্য গুনাবলী

ভাল গুণাবলী	খারাপ গুণাবলী
দ্রুত বৃদ্ধি শক্তি	কম বৃদ্ধি শক্তি
কাঠের বেশি ঘনত্ব	কাঠের কম ঘনত্ব
ছোট শাখা	বড় শাখা
ডালপালার কম বিস্তৃতি	ডালপালার বেশি বিস্তৃতি
সোজা কান্ড	বক্র কান্ড
গোলাকার তলকান্ড	ঢেউযুক্ত তলকান্ড
রোগ প্রতিরোধী	রোগ অপ্রতিরোধী
ডালপালার প্রাকৃতিক ছাটাই ক্ষমতা	ডালপালার প্রাকৃতিক ছাটাই অক্ষমতা
বড় শাখাকোণ	ছোট শাখকোণ
একক কান্ড	বহু কান্ডবিশিষ্ট
খরা প্রতিরোধী	খরা অপ্রতিরোধী
ঝড় ও বাতাস প্রতিরোধী	ঝড় ও বাতাস অপ্রতিরোধী
জলাবদ্ধতা সহনীয়	জলাবদ্ধতা অসহনীয়
লম্বা কাষ্ঠতন্তু	ছোট কাষ্ঠতন্তু
ইপিকরমিক শাখামুক্ত	ইপিকরমিক শাখাযুক্ত
রেমিকর্মমুক্ত	রেমিকর্মযুক্ত
লম্বা মধ্যপর্ব	ছোট মধ্যপর্ব
নাইট্রোজেন যুক্ত করার ক্ষমতা	নাইট্রোজেন যুক্ত করার অক্ষমতা

প্লাস ট্রি নির্বাচনে স্কোর মূল্যায়ন পদ্ধতি

১। বৃদ্ধিশক্তি ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ২৫
চিহ্নিত পাত্র গাছটির ২০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বড় গাছগুলোর (স্যাটেলাইট গাছ) গড় বেড ও উচ্চতার সাথে তুলনা করে স্কোর দিতে হবে।

ক) বেড় ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ১০

- পার্শ্ববর্তী স্যাটেলাইট গাছের চেয়ে বেশি বেড় ৯-১০
- পার্শ্ববর্তী স্যাটেলাইট গাছের সমান বেড় ৬-৮
- স্যাটেলাইট ট্রির গড় বেড় এর কাছাকাছি বা একটু কম ৩-৫
- স্যাটেলাইট ট্রির গড় বেড় এর অনেক নিচে ০-২

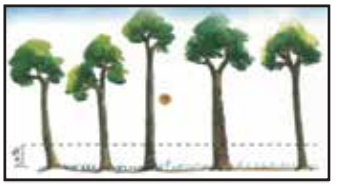
বুক সমান উঁচুতে স্যাটেলাইট ট্রির গড় বেড়ের সাথে পাত্রগাছের তুলনামূলক বেড়ের স্কোর নিরূপণ

খ) উচ্চতা ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ১০

- পার্শ্ববর্তী স্যাটেলাইট গাছের চেয়ে বেশি বেড় ১৩-১৫
- পার্শ্ববর্তী স্যাটেলাইট গাছের সমান বেড় ১১-১২
- স্যাটেলাইট ট্রির গড় বেড় এর কাছাকাছি বা একটু কম ৫-১০
- স্যাটেলাইট ট্রির গড় বেড় এর অনেক নিচে ০-৪

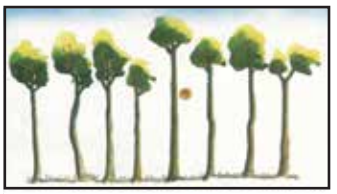
স্যাটেলাইট ট্রির গড় উচ্চতার সাথে পাত্রগাছের তুলনামূলক উচ্চতার স্কোর নিরূপণ

বোনাস ঃ ১ হেক্টর এলাকার মধ্যে যদি চিহ্নিত গাছটির বেড় ও উচ্চতা প্লটের অন্যান্য গাছের বেশি হয় তবে ১-৫ পয়েন্ট অতিরিক্ত বোনাস দেয়া যায়

২। কান্ডের আকারঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ৩০

ক) কান্ডের সরলতা/সোজা ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ১২

- কান্ড সম্পূর্ণ সোজা বা সরল ১২
- কান্ড মোটামুটি সোজা (১-২ স্থানে সামান্য বাঁকা) ১০-১১
- কান্ড সামান্য বাঁকা (১-২ স্থানে বেশি বাঁকা) ৮-৯
- কান্ড ৩-৪ স্থানে সামান্য বাঁকা ৪-৬
- কান্ড খুব বাঁকা (এক এর অধিক স্থানে বেশি বাঁকা) ০-৩

প্লাস ট্রি কান্ডের সরলতা যাচাই

খ) কান্ডের পেঁচানো ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ৩

- যদি কোন পেঁচানো কান্ড না থাকে ৩
- সামান্য পেঁচানো কান্ড ২
- বেশি পেঁচানো কান্ড ০-২

পেচানো ও সরল কান্ড

গ) কান্ডের গোলাকৃতিঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ৩

- যদি সম্পূর্ণ গোলাকার তলকান্ড থাকে ৩
- যদি মোটামুটি গোলাকার তলকান্ড থাকে ২
- যদি বক্র তলকান্ড থাকে ০-১

কান্ডের গোলাকৃতি

ঘ) কান্ডস্ফীতি ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ২

- যদি কোন কান্ডস্ফীতি না থাকে ২
- যদি কান্ডস্ফীতি থাকে ০-১

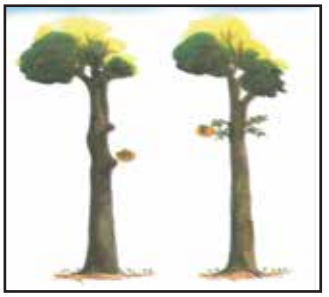

কান্ডস্ফীতি ও ইপিকরমিক শাখা

ঙ) ইপিকরমিক শাখা ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ৩

- যদি কোন ইপিকরমিক শাখা না থাকে ৩
- যদি ১-২টি ইপিকরমিক শাখা থাকে ১-২
- যদি খুব বেশি ইপিকরমিক শাখা থাকে ০

চ) গোড়ার বক্রতা ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ২

- যদি গোড়ার বক্রতা না থাকে ২
- যদি গোড়ার বক্রতা থাকে ০-১

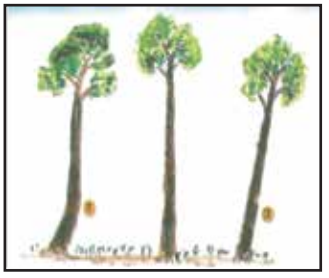

গোড়ার বক্রতা ও হেলানো কান্ড

ছ) হেলানো কান্ড ঃ সবোচ্চ পয়েন্ট = ২

- যদি কান্ড হেলানো না থাকে ২
- যদি কান্ড হেলানো থাকে ০-১

জ) ডানাস্ফীতি ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ৩

- যদি গোড়ায় ডানাস্ফীতি না থাকে ৩
- যদি গোড়ায় সামান্য ডানাস্ফীতি থাকে ২
- যদি গোড়ায় বেশি ডানাস্ফীতি থাকে ০-১

কান্ডের ডানাস্ফীতি

৩। শাখার প্রকৃতি ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ২৫

ক) শাখা কোণ ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ১৫
(প্রধান কান্ডের সাথে নিচে থেকে উপরের দিকে অবস্থিত ৩য় শাখার কোণ নির্ণয় অথবা শাখা বিভক্তির উপরে অবস্থিত মোটা কান্ডের ৩য় শাখার সাথে কোণ নির্ণয়)

শাখার কোণ (ডিগ্রি)	
৮০-৯০	১৫
৭০-৮০	১২
৬০-৭০	৮
৫০-৬০	৩
৪০-৫০	০
০-৪০	(-) ৩

শাখা কোণ নির্ণয়

খ) শাখার বেড় ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ৫
(প্রধান কান্ডে উৎপন্ন নিচ থেকে উপরের দিকে ৩য় শাখার অথবা শাখা বিভাজনের উপরের মোটা কান্ডের ৩য় শাখা বিবেচ্য)

- গাছের কান্ডের বেড় অনুপাতে শাখা খুব ছোট হলে ৫
- গাছের কান্ডের বেড় অনুপাতে শাখা খুব বেশি বড় না হলে ৪
- গাছের কান্ডের বেড় অনুপাতে শাখা খুব বেশি বড় হলে ২

শাখার বেড় নির্ণয়

গ) শাখার বিস্তৃতি ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ৫

- শাখা প্রধান কান্ডের তিন ভাগের একভাগ হলে ৫
- শাখা প্রধান কান্ডের অর্ধেক হলে ৩-৪
- শাখা প্রধান কান্ডের অর্ধেকের বেশি হলে ০-২

শাখার বিস্তৃতি নির্ণয়

৪। শীর্ষ প্রভাব ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ১০
(প্রধানত শাখা বিভক্তির নিচ পর্যন্ত কান্ডে মোট উচ্চতার শতকরা হার নির্ণয়) (কান্ডের উচ্চতা/মোট দৈর্ঘ্য) ১০০

৭০% এর উপরে	১০
৫৫-৬৯% পর্যন্ত	৭-৯
৪০-৫৪% পর্যন্ত	৪-৬
২৫-৩৯% পর্যন্ত	১-৩
২৫% এর নিচে	০

শীর্ষ প্রভাব নিরূপণ

৫। শাখা বিভক্তি ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ১০
(মুলকান্ডের যে উচ্চতায় প্রধান শাখা বিভক্তি হয়েছে তা নির্ণয়-প্রজাতি ভিত্তিক করতে হবে)

- মিটারের উপরে শাখা বিভক্ত থাকলে ১০
- মিটারের মধ্যে শাখা বিভক্তি থাকলে ৬-৯
- মিটারের নিচে শাখা বিভক্তি থাকলে ০-৫

কান্ডের শাখা বিভক্তি

৬। স্বাস্থ্য/সবলতা ঃ সর্চোচ্চ পয়েন্ট = ২০
নির্বাচিত গাছটি সবল এবং পোকামাকড় ও রোগবালাইমুক্ত থাকা বাঞ্চনীয়। কান্ড ও শাখা প্রশাখার রোগ বালাই ও পোকার আক্রমণে সৃষ্ট বিভিন্ন ক্ষতের উপর ভিত্তি করে পয়েন্ট প্রদান করা হয়।

ক) শাখা-প্রশাখা অবস্থা ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ১০

- সম্পূর্ণ রোগমুক্ত/যদি কোন ক্ষত না থাকে ১০
- সামান্য আক্রান্ত ৫
- সবল নয় বা বেশি ক্ষত আছে নির্বাচন অযোগ্য/ অগ্রহণযোগ্য

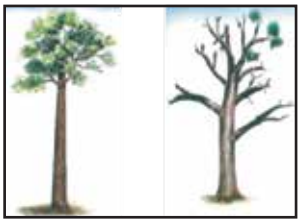
সুস্থ ও রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা

খ) কান্ডের অবস্থা ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ১০

- সম্পূর্ণ রোগমুক্ত/যদি কোন ক্ষত না থাকে ১০
- সামান্য আক্রান্ত ৫
- সবল নয় বা বেশি ক্ষত আছে নির্বাচন অযোগ্য/ অগ্রহণযোগ্য

সুস্থ ও রোগাক্রান্ত কান্ড

৭। ফুল/ফল উৎপাদন ক্ষমতা ঃ সর্বোচ্চ পয়েন্ট = ৫

- প্রচুর ফুল ফল হয় ৫
- মোটামুটি ফুল ফল হয় ৩-৪
- অল্প ফুল ও ফল ০-২

ফুল ও ফল উৎপাদন ক্ষমতা

নির্বাচিত গাছ বা প্লাস ট্রির প্রকার

ক) গ্রহণযোগ্য গাছ ঃ যদি কোন পাত্র গাছ উপাত্ত সংগ্রহের পর সর্বমোট ৮০-৯০ পয়েন্ট পায় তবে ১টি ব্যান্ড দ্বারা বুকের উচ্চতায় রং দিতে হবে এবং এই ব্যান্ডের নিচে নাম্বার দিতে হবে।

খ) প্লাস ট্রি ঃ যদি কোন পাত্র গাছ ৯০ পয়েন্টের উপরে স্কোর পায় তবে ২টি ব্যান্ড দ্বারা বুকের উচ্চতায় রং দিতে হবে এবং ব্যান্ডের মাঝখানে নাম্বার দিতে হবে।

গ) অগ্রহণযোগ্য গাছ ঃ যদি কোন পাত্র গাছ ৮০ পয়েন্টের কম স্কোর পায়।

নাম্বারিং-এর জন্য ব্যবহৃত কোড

নির্বাচিত প্লাস ট্রিতে/গ্রহণযোগ্য গাছে ব্যান্ড দেওয়ার পর যাতে প্লাস ট্রি সনাক্ত করা যায় সেজন্য এলাকাভিত্তিক ও প্রজাতিভিত্তিক ক্রমনানুসারে নাম্বার দিতে হবে। নিম্নে প্লাস ট্রি নাম্বারিং এর একটি নমুনা দেয়া হ'ল:

প্রজাতির কোড

মেহগনি	=	০১	দেবদারু	=	১৭
ইউক্যালিপটাস	=	০২	রাজকড়ই	=	১৮
ঘোড়ানিম	=	০৩	ম্যানজিয়াম	=	১৯
রেইনট্রি	=	০৪	জিগনি	=	২০
আকাশমনি	=	০৫	খয়ের	=	২১
নিম	=	০৬	পিতরাজ	=	২২
শিশু	=	০৭	ঢাকিজাম	=	২৩
সেগুন	=	০৮	গর্জন	=	২৪
ইপিল ইপিল	=	০৯	শিমুল	=	২৫
শিলকড়ই	=	১০	চাপালিশ	=	২৬
গামার	=	১১	চাম্পা	=	২৭
অর্জুন	=	১২	তেলশুর	=	২৮
বাবলা	=	১৩	চিকরাশি	=	২৯
কদম	=	১৪	সিভিট	=	৩০
মিনজিরি	=	১৫	লোহাকাঠ	=	৩১
কালকড়ই	=	১৬	তুন	=	৩২

জেলা কোড

০১	=	পঞ্চগড়
০২	=	ঠাকুরগাঁও
০৩	=	দিনাজপুর
০৪	=	নীলফামারী
০৫	=	লালমনিরহাট
০৬	=	রংপুর
০৭	=	কুড়িগ্রাম
০৮	=	গাইবান্ধা
০৯	=	জয়পুরহাট
১০	=	বগুড়া
১১	=	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১২	=	নওগাঁ
১৩	=	রাজশাহী
১৪	=	নাটোর
১৫	=	সিরাজগঞ্জ
১৬	=	পাবনা
১৭	=	মেহেরপুর
১৮	=	কুষ্টিয়া
১৯	=	চুয়াডাঙ্গা
২০	=	ঝিনাইদহ
২১	=	যশোর
২২	=	মাগুরা
২৩	=	নড়াইল
২৪	=	বাগেরহাট
২৫	=	খুলনা
২৬	=	সাতক্ষীরা
২৭	=	বরগুনা
২৮	=	পটুয়াখালী
২৯	=	ভোলা
৩০	=	বরিশাল
৩১	=	পিরোজপুর
৩২	=	ঝালকাঠি
৩৩	=	টাঙ্গাইল
৩৪	=	জামালপুর
৩৫	=	শেরপুর
৩৬	=	ময়মনসিংহ
৩৭	=	নেত্রকোনা
৩৮	=	কিশোরগঞ্জ
৩৯	=	মানিকগঞ্জ
৪০	=	মুন্সিগঞ্জ
৪১	=	ঢাকা
৪২	=	গাজীপুর
৪৩	=	নরসিংদি
৪৪	=	নারায়ণগঞ্জ
৪৫	=	রাজবাড়ি
৪৬	=	ফরিদপুর
৪৭	=	গোপালগঞ্জ
৪৮	=	মাদারীপুর
৪৯	=	শরীয়তপুর
৫০	=	সুনামগঞ্জ
৫১	=	সিলেট
৫২	=	মৌলভীবাজার
৫৩	=	হবিগঞ্জ
৫৪	=	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫৫	=	কুমিল্লা
৫৬	=	চাঁদপুর
৫৭	=	ফেনী
৫৮	=	নোয়াখালী
৫৯	=	লক্ষীপুর
৬০	=	চট্টগ্রাম
৬১	=	কক্সবাজার
৬২	=	খাগড়াছড়ি
৬৩	=	রাঙ্গামাটি
৬৪	=	বান্দরবান

প্লাস ট্রি কোড

তিনটি সংখ্যা দ্বারা
প্রজাতিভিত্তিক ক্রমানুসারে
নাম্বার দিতে হবে

প্লাস ট্রি রেকর্ড ফরম

প্রজাতি ঃ ....

অবস্থান ঃ ....

ঢালুত্ব ঃ উঁচু/মাঝারি/নিচু/সমতল ভুমি (টিক চিহ্ন দিন)

দিক ঃ উত্তর/উত্তরপূর্ব/উত্তরপশ্চিম/দক্ষিণ/দক্ষিণপূর্ব/পূর্বপশ্চিম (টিক চিহ্ন দিন)

বাতাসের তীব্রতা ঃ সুরক্ষিত/মাঝারি/নিচু (টিক চিহ্ন দিন)

স্থানীয় অবস্থানের ভিত্তিতে উচ্চতা ঃ উঁচু/মাঝারি/নিচু (টিক চিহ্ন দিন)

বাগানের উৎপত্তি ঃ অক্ষত প্রাকৃতিক বাগান/সৃজিত বাগান/প্রাকৃতিক বন/সারিবদ্ধ বাগান (টিক চিহ্ন দিন)

পাত্র গাছ থেকে পার্শ্ববর্তী নির্বাচিত গাছের দুরত্বঃ..... ..... মিটার

পাত্র গাছ ২০ মিটারের মধ্যে ফুলবতী গাছের সংখ্যাঃ.....

পাত্র গাছের রেকর্ডঃ

উচ্চতাঃ ..... মিটার, বুক সমান উচ্চতায় বেড় (ডিবিএইচ) ..... সেন্টিমিটার

বয়স .... বছর, শাখার বিস্তৃতি .... মিটার

ভূমি থেকে প্রথম শাখার উচ্চতা ঃ .... মিটার

ভুমি থেকে তৃতীয় শাখা প্রধান কান্ডের সহিত কৌণিক দুরত্ব .... ডিগ্রি

পার্শ্ববর্তী বড়গাছের (স্যাটেলাইট ট্রি) পরিমাপ

ক্রমিক নং	উচ্চতা	ডিবিএইচ	প্রধান কান্ডের উচ্চতা
১			
২			
৩			
৪			
৫			
৬			
৭			
৮			
৯			
১০			
গড়			

ছবি

প্লাস ট্রি নির্বাচন মূল্যায়ন

ক্রমিক নং	বৈশিষ্ট্যসমূহ	সর্বোচ্চ পয়েন্ট/মান	প্রাপ্ত পয়েন্ট/কমান	মন্তব্য
০১	বৃদ্ধি শক্তি			
	ক) বেড়	১০		
	খ) উচ্চতা	১৫		
০২	কান্ডের আকার			
	ক) সরলতা/সোজা	১২		
	খ) পেঁচানো কান্ড	০৩		
	গ) গোলাকার তলকান্ড	০৩		
	ঘ) কান্ডস্ফীতি	০২		
	ঙ) ইপিকরমিক শাখা	০৩		
	চ) গোড়ার বক্রতা	০২		
	ছ) হেলানো কান্ড	০২		
	জ) ডানাস্ফীতি	০৩		
০৩	শাখা প্রকৃতি			
	ক) শাখাকোণ	১৫		
	খ) শাখার বেড়	০৫		
	গ) শাখার বিস্তৃতি	০৫		
০৪	শীর্ষ প্রভাব	১০		
০৫	শাখা বিভক্তি	১০		
০৬	স্বাস্থ্য/সবলতা			
	ক) শাখা প্রশাখার অবস্থান	১০		
	খ) কান্ডের অবস্থা	১০		
০৭	ফুল/ফল উৎপাদন	০৫		
মোট				

মূল্যায়নকারী

মূল্যায়নের তারিখ

অঙ্গজ উপায়ে হাইব্রিড একাশিয়ার বংশ বিস্তার

হাইব্রিড একাশিয়া (Acacia hybrid)

হাইব্রিড একাশিয়ার বাগান

হাইব্রিড একাশিয়া (Acacia hybrid) হচ্ছে আকাশমণি *(Acacia auriculiformis)* এবং ম্যানজিয়াম *(Acacia mangium)* নামক দুইটি আলাদা প্রজাতির মধ্যে প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন সংকর জাতীয় গাছ। এটি মাইমোসেসি (Mimosaceae) পরিবারভুক্ত গাছ। এ জাতীয় বৃক্ষসমূহ বনাঞ্চলে উত্তোলিত আকাশমণি অথবা ম্যানজিয়াম প্রজাতির বাগানে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। এটি চিরহরিৎ মাঝারি আকারের বৃক্ষ।

কাটিং সংগ্রহের সুবিধার্থে টবে রক্ষিত চারা

পরিণত বয়সে উপযুক্ত পরিবেশে এগাছ ২৫-৩০ মিটার উচু হয়ে থাকে। ১০-১২ বছর বয়সে কান্ডের বেড় ৭০-৮০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এ গাছ আকাশমণি গাছের তুলনায় আকাবাকা কম হয়। অধিকন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে ম্যানজিয়ামের হার্ট রট বা কান্ড পচাঁ রোগের যে প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তাহা অদ্যাবধি হাইব্রিড একাশিয়ার বেলায় পাওয়া যায়নি। বাগানে আকাশমণি অথবা ম্যানজিয়াম প্রজাতির চেয়ে হাইব্রিড একাশিয়ার দ্রুততর বৃদ্ধি নার্সারি মালিক এবং বনায়নে নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহজেই উদ্বুদ্ধ করে।

হাইব্রিড একাশিয়া বীজের মাধ্যমেও বংশ বিস্তার করা যায়। এ পদ্ধতিতে চিহ্নিত মাতৃ গাছের বীজ হতে উৎপন্ন চারাতে মাতৃগাছের গুনাগুন সম্পূর্ণ বজায় থাকেনা। নার্সারিতে চারায় প্রজাতিগত ভিন্নতা দেখা যায়। নার্সারিতে হাইব্রিড একাশিয়া, আকাশমণি এবং ম্যানজিয়াম এই তিন ধরণের চারা পাওয়া যায়। প্রাপ্ত চারার মধ্যে হাইব্রিড একাশিয়ার চারার শতকরা হার খুবই কম (১০-১৫%)। অপরদিকে একটু কৌশল অবলম্বন করলে অঙ্গজ জনন উপায়ের মাধ্যমে এ প্রজাতির বলিষ্ঠ সবল এবং উন্নতমানের চারা উত্তোলন করা সম্ভব। এ পদ্ধতিতে সৃষ্ট চারায় মাতৃগাছের গুনাগুন সম্পুর্ণ বজায় থাকে।

হাইব্রিড একাশিয়ার গাছে মাতৃগাছ আকাশমণি অথবা ম্যানজিয়াম প্রজাতির চেয়ে কম বীজ হয়। বীজ থেকে উত্তোলিত চারার বৃদ্ধি, পাতার আকার, কান্ডের রং ও আকৃতিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং পরের জেনারেশনে এদের বৃদ্ধি অনেক কমে যায় যাহা কাঙ্খিত নহে।

হাইব্রিড একাশিয়া মাতৃগাছ আকাশমণি অথবা ম্যানজিয়াম প্রজাতির চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে এবং একই গাছ থেকে সংগৃহীত একই বয়সী বীজের চারার চেয়ে কাটিং দ্বারা তৈরি চারার বৃদ্ধি অনেক বেশি। গবেষণায় ইহা প্রমাণিত।

হাইব্রিড একাশিয়ার অঙ্গজ জননের উদ্দেশ্য

১. মাতৃগাছের গুনাগুন সম্পূর্ণরূপে চারায় প্রতিফলিত করা
২. নার্সারিতে বীজ হতে উৎপন্ন চারায় যে প্রজাতিগত ভিন্নতা দেখা যায় তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া।
৩. অধিকতর বৃদ্ধিসম্পন্ন বাগান সৃজন করা ।

উপযুক্ত পরিবেশ ও সময়

বায়ুমন্ডলে তথা নার্সারিতে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সারা বছর ধরে কাটিং এর মাধ্যমে এ প্রজাতির অঙ্গজ জনন করা যায়। বর্ষাকালে রোপিত কাটিংএ ব্যাপক মুল গজায় এবং সাফল্যের হার সবচেয়ে বেশী এবং শীতকালে সাফল্যের হার সবচেয়ে কম। নার্সারিতে আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে শুষ্ক মৌসুমে দিনে ৪/৫ বার পানি দেওয়া এবং রোদ ও বৃষ্টির তীব্রতা থেকে রক্ষা করার জন্যে বেডের উপরে আচ্ছাদন দেওয়া উত্তম।

কোথায় করবেন

কাটিং থেকে চারা উৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ বালির বেড ব্যবহার করা হয়। নার্সারিতে সাধারণতঃ ৪ ফুট চওড়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লম্বা বেড বালি দিয়ে মাটি থেকে ৬-৭ ইঞ্চি উচু অথবা নার্সারির মাটি অপসারণ করে ৬-৭ ইঞ্চি গভীর গর্ত করে বালি দিয়ে পূর্ণ করে বেড প্রস্তুত করতে হয়। তৈরিকৃত বেডের নীচের তিনভাগের একভাগ মোটা বালি এবং তার উপরের দুইভাগ চিকন বালি দিয়ে ভরাট করতে হয়।

কাটিং রোপণ করার জন্য তৈরিকৃত বেড

কিভাবে করবেন

অঙ্গজ জননের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কাটিং পদ্ধতির মাধ্যমে সহজেই বংশ বিস্তার করা যায়। এক্ষেত্রে দুই পর্ব বিশিষ্ট কাটিং সর্বোত্তম। সদ্য গজানো ডাল যাহা ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়েছে কিন্তু খুব শক্ত নহে এমন ডাল নির্বাচন করাই উত্তম কারণ কাটিং এর মুল গজানো অনেকটা ডালের সতেজতার উপর নির্ভর করে। কর্তিত ডাল পানি ছিটিয়ে আর্দ্র করে পলিথিন ব্যাগে ভর্তি করে স্থানান্তর করাই ভাল এবং রোপণের পূর্ব পর্যন্ত ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব দ্রুত বেডে দিতে হবে।

সায়ন সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত ডাল

ডাল হইতে তৈরিকৃত কাটিং বেডে রোপণ করা কাটিং

নার্সারিতে নির্বাচিত ডালের আগার ২-৩ সেন্টিমিটার বাদে বাকী অংশ ২টি পর্বসহ (Node) কাটা হয়। কাটিং তাড়াতাড়ি না শুকানোর জন্য বেডে দেওয়ার পূর্বে পাতার অর্ধেক কেটে দেওয়া হয়। কাটিং কাটার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কান্ড থেতলে না যায় এবং সে জন্য ধারালো কাঁচি অথবা ছুরি ব্যবহার করতে হবে।

শিকড় সমৃদ্ধ কাটিং সমূহ

কাটিং লাগানোর পূর্বে বেডকে ভালভাবে ভিজাতে হবে যাতে কাটিং সহজেই লাগানো যায়। দুই পর্ব বিশিষ্ট কাটিং এর নীচের প্রান্ত বেডে ৫ সেন্টিমিটার x ৫ সেন্টিমিটার দুরত্বে ৪৫° কোণে এমন ভাবে পুতে দিতে হবে যাতে নীচের পর্ব বালির যথেষ্ট নীচে থাকে এবং উপরের পর্ব বালির উপরে থাকে। বেডে লাগানোর পূর্বে কাটিং এর নীচের অংশ ৫০০ পিপিএম IBA (Indole-3 Buteyric Acid) হরমোনে চুবালে সাফল্যের হার বেশী হয়।

পরিচর্যা

কাটিং রোপণকৃত বেডের উপর ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বেড যাতে শুকিয়ে না যায় সে জন্য দৈনিক ৩-৪ বার ঝরণা দ্বারা পানি ছিটায়ে দিতে হবে। এভাবে পরিচর্যা করলে ১৫-২০ দিনের মধ্যে উপরের পর্ব থেকে পাতা এবং নীচের পর্ব থেকে শিকড় গজাবে। গজানো পাতার আকৃতি দেখে শিকড়ের পরিমাণ অনুমান করা যায়। কাটিং বেডে দেওয়ার একমাস পর শিকড় সমৃদ্ধ কাটিং ব্যাগে/পাত্রে স্থানান্তর উপযোগী হয়। শিকড় সমৃদ্ধ চারা বেড হইতে উত্তোলন করার পূর্বে বেডে যথেষ্ঠ পানি দিয়ে সেচ দিতে হয় যাতে উত্তোলন করার সময় শিকড় অক্ষত থাকে। ঝুরঝুরে পটিং মিক্সার দ্বারা ভর্তি ব্যাগের মধ্যখানে কাঠি দ্বারা গর্ত করত: সাবধানে শিকড় সমৃদ্ধ চারা বসিয়ে মাটি দ্বারা গর্ত বন্ধ করে চারা বেডে স্থানান্তর করতে হয়। ব্যাগে স্থানান্তর করার পর ঝরনা দ্বারা পর্যাপ্ত পানি সেচ দিতে হয় যাতে ব্যাগের মাটি সম্পূর্ণরূপে ভিজে যায়। দিনের বেলায় স্থানান্তরকৃত বেডের চারার উপর ২-৩ দিন ছায়া প্রদান করলে চারা সহজেই ব্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত চারা অন্যান্য চারার মত বেডে ৬০-৭০ দিন পরিচর্যা করলে কাটিংসমূহ বাগানে রোপণের উপযোগী হয়।

ব্যাগে প্রতিষ্ঠিত চারা

সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ

কোথায় কি গাছ লাগাবেন

সঠিক জায়গায় সঠিক প্রজাতির চারা রোপণ বনায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। স্থান ও গাছের বৈশিষ্ট্য বিচারে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রোপণ-উপযোগী বনজ গাছের নাম নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

পাহাড়ি বন ভুমিতে রোপণ-উপযোগী গাছ

পাহাড়ের উপরিভাগ ঃ গর্জন, গামার, চম্পা, চিকরাশি, সিভিট, তেলশুর, উরিআম, আমলকী, পাইন্যাগোলা /লুকলুকি, কনক, ধারমারা, শিলভাদি, গুটগুটিয়া, ঝাউ, আকাশমনি ইত্যাদি।

মধ্যঢাল থেকে পাদদেশ পর্যন্ত ঃ গর্জন, গামার, কালাকড়ই, চাপালিশ, মেহগনি, শিলকড়ই, সেগুন, তেলশুর, চম্পা, সিভিট, শিমুল, ছাতিয়ান, জারুল, তেঁতুল, ঝাউ, ঢাকিজাম, পিতরাজ, কাইঞ্জলভাদি, তুন, বট, বকুল, তেতুয়াকড়ই, লোহাকাঠ, চিকরাশি, বৈলাম, টালি, বান্দরহোলা, তেজবহল, বাজনা, গুটগুটিয়া, উদাল, চালমুগরা, কন্যারি, পাদুক, চন্দুল, নারিকেলী, কামদেব, রক্তন, বনাক, ধারমারা, হারগোজা, মোচ, রাতা, উড়িআম, রাবার, কাঁঠাল, লেবু, বেল, পেয়ারা, বর্ত্তা, কাউ, গাব, কালোজাম, হরিতকি, আমলকি, বহেরা, উলটকম্বল, অর্জুন, বাশঁ, বেত ইত্যাদি।

পাহাড়ি এলাকার নিচু ভুমি (যেখানে বছরের কোন না কোন সময় পানি থাকে) ঃ জারুল, কদম, পুতিজাম, ডেপাজাম, কালোজাম, পিটালি, ডুমুর, শিমূল, চাকুয়াকড়ই, কালাকড়ই, বান্দরহোলা, মান্দার, হিজল, বট, অশ্বথ, জিগা, কাঞ্চন, বারিয়ালা বাঁশ, বেত ইত্যাদি।

রাস্তা ও সড়কের ধারে রোপণ-উপযোগী গাছ

সড়ক ও মহাসড়ক ঃ রেইনট্রি, রাজকড়ই, শিলকড়ই, কালাকড়ই, শিশু, মেহগনি, অর্জুন, দেবদারু, ঝাউ, চিকরাশি, তেলশুর, বকুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, সোনালু, নিম, লোহাকাঠ, আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি। পানি উঠে বা পানি জমে থাকে এরূপ জায়গায় জারুল, কদম, হিজল, জাম, মান্দার ইত্যাদি।

ফিডার রোড ঃ শিশু, নিম, দেবদারু, চম্পা, ইপিল-ইপিল, তুন, জাম, জাম্বুরা, বাবলা, খয়ের, বকফুল, সিন্দুরী, অড়হর, বগামেড়ুলা, তাল, খেজুর, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি।

সিটি রোড ঃ দেবদারু, মেহগনি, নিম, চম্পা, নাগেশ্বর, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, সোনালু, বটল-পাম, ঝাউ ইত্যাদি।

সিটি আইল্যান্ড ঃ উইপিং দেবদারু, বটল-পাম, বটল-ব্রাশ, এরিকা-পাম, কামিনি, চেরী, জারুল, নাগেশ্বর, সিন্দুরী, জবা, গন্ধরাজ, বাগান বিলাস, মোসেন্ডা, থুজা, অশোক, রাধাচূড়া ইত্যাদি।

রেল লাইন ঃ তাল, খেজুর বাবলা, খয়ের, বকফুল, সিন্দুরী, বেল, রাজকড়ই ইত্যাদি। পানি জমে এরূপ জায়গায় জারুল, হিজল, কদম, জাম, মান্দার ইত্যাদি।

বাঁধের ধার ঃ তাল, খেজুর, বাবলা, খৈয়া-বাবলা, পুনিয়াল, নারিকেল, ঝাউ, বাঁশ, জারুল, মান্দার, জাম, কদম ইত্যাদি।

বিল এলাকায় (যেখানে বছরের ২-৩ মাস পানি জমে থাকে) রোপণ-উপযোগী গাছ

হিজল, করচ, পানি বিয়াস, পিটালি, জারুল, মান্দার, বরুন, পলাশ, কদম, চালতা, পুতিজাম, ডেপাজাম, পিতরাজ, অর্জুন, আম ইত্যাদি।

বসতবাড়ীর আশে পাশে রোপণ-উপযোগী গাছ

নিম, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বেল, আমড়া, নারিকেল, তাল, খেজুর, লটকন, কাউ, সজিনা, বকফুল, সুপারি, লিচু, জাম্বুরা, জলপাই, বেলম্বু, কামরাঙ্গা, ডালিম, কুল, লেবু, তেজপাতা, দারুচিনি, বিলাতিগাব, সফেদা, কলা, পেঁপে, তুন, শিলকড়ই, গামার, কদম, অড়হর, বাসক, পাথরকুচি, বাঁশ ইত্যাদি। বর্ষার পানি জমে থাকে এমন জায়গায় কদম, জারুল, পিটালি, বরুন, জাম ইত্যাদি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, হাসপতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে রোপণ-উপযোগী গাছ

নারিকেল, তাল, কাঠবাদাম, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম্বুরা, গাব, লিচু, কাউ, চম্পা, মেহগনি, তেলশুর, জারুল, সোনালু, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, কামিনি, বকুল, অশোক, নাগেশ্বর, উইপিং দেবদারু, বটল-ব্রাশ, বটল-পাম, অরোকেরিয়া, থুজা ইত্যাদি।

পুকুর পাড়ে রোপণ-উপযোগী গাছ

নারিকেল, তাল, সুপারি, খেজুর, পেয়ারা, জাম্বুরা, লেবু, আম, কাঁঠাল, বাঁশ ইত্যাদি।

শিল্প অঞ্চলে রোপণ-উপযোগী গাছ

মেহগনি, নিম, নারিকেল, তাল, বকুল, নাগেশ্বর, দেবদারু, গাব, উইপিং দেবদারু, রাজকড়ই, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, থুজা, অরোকেরিয়া ইত্যাদি।

হাট-বাজারে রোপণ-উপযোগী গাছ

বট, অশ্বথ, তেঁতুল মেহগনি, কাঠবাদাম, রেইনট্রি ইত্যাদি।

কবরস্থান ও শ্মশানে রোপণ-উপযোগী গাছ

কাঁঠাল, আম, মেহগনি, বকুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, নাগেশ্বর শিমুল, বট, দেশিগাব, অশ্বথ, বেল, চম্পা, ঝাউ, বটল-ব্রাশ, বটল-পাম, অরোকেরিয়া, সোনালু, পাতাবাহার, রঙ্গন, থুজা, কামিনি, সুপারি, বাঁশ ইত্যাদি।

ক্ষেতের আইলে রোপণ-উপযোগী গাছ

তাল, খেজুর, সুপারি, বাবলা, খয়ের, বকাইন, বকফুল, ধৈঞ্চা, মান্দার, জিগা, কড়ই, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি।

উপকূলীয় এলাকার নতুন জেগে উঠা চরে রোপণ-উপযোগী গাছ

কেওড়া, বাইন, কাকড়া, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি।

উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা উচুঁ চর (যেখানে ম্যানগ্রোভ জন্মে না)

বাবলা, ঝাউ, সনবলই, সাদাকড়ই, কালাকড়ই, জারুল, রেইনট্রি ইত্যাদি।

নদী বক্ষে জেগে উঠা নতুন চরে রোপণ-উপযোগী গাছ

ঝাউ, লোনা-ঝাউ (লবণাক্ত এলাকায়), পিটালি, করচ, পানিবিয়াস ইত্যাদি।

প্রাসংগিক তথ্য

- স্থান উপযোগিতার ভিত্তিতে গাছ লাগাতে হবে। যেমন, বেশি পানি সহ্য করতে পারেনা এমন প্রজাতি পানির ধারে লাগানো যাবে **না**;
- পুকুর পাড়ে পাতাঝরা বৃক্ষ না লাগানোই ভাল;
- বৈদ্যুতিক তারের নিচে বা কাছে বেশি লম্বা হয় ও ডাল-পালা ছড়ায় এমন গাছ লাগানো যাবেনা;
- বড় এলাকাজুড়ে এক প্রজাতির বাগান না করে বহু প্রজাতির মিশ্র বাগান করতে হবে;
- সঠিক সময়ে বাগানের গাছ পাতলা করতে হবে। বেশি ডাল-পালা ছাঁটাই করে গাছের গঠন ঠিক রাখতে হবে। রোগ-বালাই, গরু ছাগলের হাত থেকে চারা ও পূর্ণ বয়স্ক গাছকে রক্ষা করতে হবে;
- জ্বালানী কাঠের জন্য ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া ইত্যাদি গাছ ৪-৫ বছর পর পর কেঁটে কাঠ আহরণ করতে হবে;
- কর্তিত গাছের মোথা থেকে নতুন কুশি বা কপিস বের হয়ে নতুন কান্ডে রূপান্তরিত হয়। এভাবে ৪-৫ বছর আবর্তে কপিস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একাধিকবার জ্বালানী কাঠ আহরণ করা যাবে;
- প্রথম ১-২ বছর বনজ গাছের সাথে সাথি ফসলের চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

স্বদেশি প্রজাতির বৃক্ষ রোপণের প্রতি গুরুত্ব দিন
নির্বাচিত মাতৃবৃক্ষ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন

বৃক্ষের চারা রোপণ ও পরিচর্যা

বৃক্ষ রোপণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে

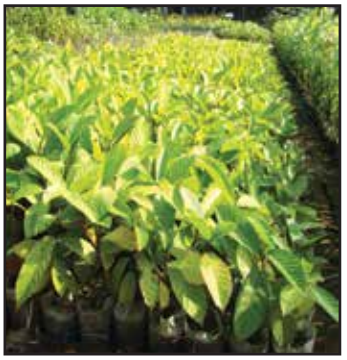

- জুন মাসের পূর্বেই চারা রোপণের প্রস্তুতি নিন
- ব্যবহারের প্রয়োজন (জ্বালানী, খুঁটি, কাঠ, মন্ড ও ঔষধি ইত্যাদি) অনুযায়ী প্রজাতি নির্বাচন করুন
- চারা রোপণের জন্য সঠিক স্থান চিহ্নিত করুন
- কোথায় কি চারা লাগাবেন তার একটি পূর্ব পরিকল্পনা করে নিন
- বৃক্ষের আবর্তন কাল অনুযায়ী স্বল্প মেয়াদি (৫-১০ বছর), মধ্য মেয়াদি (১০-১৮ বছর) ও দীর্ঘ মেয়াদি (১৮-৪০ বছর) বৃক্ষ প্রজাতি নির্বাচন করুন
- দেশীয় প্রজাতির চারা রোপণের প্রতি গুরুত্ব দিন
- একক প্রজাতির বাগান না করে মিশ্র প্রজাতির বাগানের প্রতি গুরুত্ব দিন
- কাঙ্ক্ষিত প্রজাতির চারা উত্তোলনের ব্যবস্থা নিন অথবা নার্সারি থেকে চারা প্রাপ্তি নিশ্চিত করুন
- চারা উত্তোলনের জন্য উন্নত মাতৃ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন
- নার্সারি হতে উন্নতমানের চারা বাছাই করুন এবং দূর্বল, রুগ্ন ও বেশি বয়সের চারা বর্জন করুন
- বৈদ্যুতিক লাইনের নীচে কোন বৃক্ষ বা বাঁশ লাগাবেন না

চারা রোপণ পদ্ধতি

- চারা রোপণের আগে নির্বাচিত স্থান প্রয়োজন মতো পরিষ্কার করুন এবং খুঁটি দিয়ে চিহ্নিত ও সঠিক দূরত্ব নির্ধারণ করুন
- ৪৫ সে.মি. থেকে ৫০ সে.মি. উঁচু, কানি আঙ্গুল সমান গোড়ার বেড়, যথেষ্ট শিকড় সমৃদ্ধ, সোজা ও ডাল-পালা বিহীন চারা সংগ্রহ করুন
- দুই বছর বয়সী চারার জন্য ৫০ সে.মি. x ৫০ সে.মি. x ৫০ সে.মি., এক বছর বয়সী চারার জন্য ৪৫ সে.মি. x ৪৫ সে.মি. x ৪৫ সে.মি., ছয় মাস বয়সী চারার জন্য ৩০ সে.মি. x ৩০ সে.মি. x ৩০ সে.মি. মাপের গর্ত তৈরি করুন
- জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত নির্ধারিত স্থানে চারা রোপণ করুন
- চারা রোপণের গর্ত করার সময় গর্তের উপরের মাটি এক দিকে ও নিচের/ভিতরের মাটি অন্য দিকে রাখুন
- চিহ্নিত স্থানের মাটি গুড়া করুন এবং সমপরিমাণ গোবর সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে নিন
- গর্ত ভরাটের সময় নিচের মাটি উপরে ও উপরের মাটি নিচে দিতে হবে
- লক্ষ্য রাখবেন, পরিবহনের সময় চারা যেন আঘাত না পায়
- চারা আনার পর শক্ত ও সতেজ হওয়ার জন্য চারাটি কয়েক দিন ছায়াযুক্ত স্থানে রাখুন এবং প্রতিদিন প্রয়োজন মতো পানি দিন

- চারা রোপণের সময় ধারালো ছুরি দিয়ে পলিথিন ব্যাগটি কেটে অন্যত্র সরিয়ে ফেলুন
- গর্তের মাঝখানে চারা রোপণ করুন
- রোপণের সময় চারার গোড়ার মাটির দলা বা পিন্ডটি যেন ভেঙ্গে না যায় সেদিকে নজর দিন
- চারা লাগানোর পর ভাল করে চারার গোড়ার মাটি চেপে দিন
- চারা লাগানোর সময় চারার চেয়ে লম্বা বাঁশের খুঁটির সাথে হালকা করে সুতা দিয়ে চারাটি বেঁধে দিন, যেন বাতাসে নড়া চড়া করতে না পারে
- মাটি শুকনা থাকলে চারা রোপণের পরপরই সেচ দিন

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

মনে রাখবেন শুধু চারা রোপণ নয় চারাকে টিকিয়ে রাখাই বড় কাজ।

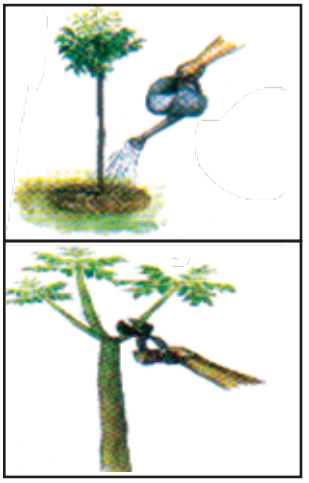

- রোপণকৃত চারায় বেড়া দেয়ার ব্যবস্থা করুন
- গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, সজারু থেকে রক্ষা করুন
- চারা রোগাক্রান্ত বা পোকা-মাকড়ে আক্রান্ত হলে রোগ-বালাই নাশক প্রয়োগ করুন, প্রয়োজনে স্থানীয় বন কর্মী বা কৃষি কর্মীর পরামর্শ নিন
- খরার সময় প্রয়োজনে চারার গোড়ায় পানি দিন
- চারায় বেয়ে উঠা লতা কেটে দিন ও গোড়া আগাছা মুক্ত রাখুন
- শীতকালে চারার গোড়ার মাটি যেন রসযুক্ত থাকে সেজন্য শুকনো লতা-পাতা, খড়, কচুরিপানা ইত্যাদি দিয়ে চারা গোড়া ঢেকে দিন
- মরা, রোগাক্রান্ত ও দূর্বল চারা সরিয়ে নতুনভাবে মান সম্পন্ন সবল ও সতেজ চারা লাগানোর ব্যবস্থা নিন

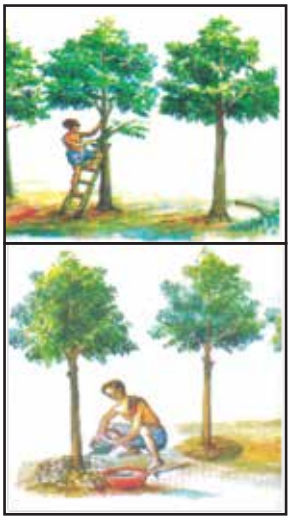

- বেড়ে ওঠা গাছের একাধিক ডাল-পালা হলে, ডাল-পালা ধারালো দা, ছুরি বা সিকেচার দিয়ে কেটে ফেলুন
- কাটার সময় দা এর আঘাতে ডাল-পালা যেন থেতলে না যায় এবং প্রধান কান্ডে আঘাত না লাগে সেদিকে নজর দিন
- বর্ষার আগে ও বর্ষার পরে পরিমাণ মতো গোবর সার চারার গোড়ায় ব্যবহার করুন
- বর্ষার পানি যেন চারার গোড়ায় জমতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখুন। প্রয়োজনে চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে উঁচু করে নিন
- চারা গাছের গোড়ার শিকড় কোন কারণে বের হয়ে গেলে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিন
- জলোচ্ছ্বাস কবলিত এলাকায় চারার গোড়ায় জমে থাকা পলি, আবর্জনা সরিয়ে ফেলুন
- ৫-৬ বছর বয়সে বাগানের গাছ থিনিং (পাতলাকরণ) পদ্ধতি অনুসরণ করে থিনিং (পাতলা) করুন

যতনে রতন মিলে

কৃষি জমির আইলে বৃক্ষ রোপণ

কৃষি জমির আইলে বৃক্ষ রোপণ করে ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করুন

আইলে কেন বৃক্ষ রোপণ করব?

- আইলের গাছ জমি শীতল রাখবে ও মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ, উর্বরতা এবং কৃষি শ্রমিকের কর্মক্ষমতা বাড়াবে
- আইলের বৃক্ষ লু-হাওয়া থেকে ভূমি ও ফসল বিনষ্ট হওয়া হ্রাস করবে
- আইলে রোপিত বৃক্ষের ডালপালা ছেটে প্রয়োজনে পশু খাদ্য এবং জ্বালানী সংগ্রহ করা সম্ভব হবে
- সঠিক ভাবে ডালপালা ও শিকড় ছাটাই করে রাখলে আইলের বৃক্ষ ফসলের ক্ষতি করবে না, বরং পোকা-মাকড় ভোজী পাখির আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করবে
- বিপদে-আপদে গাছ বিক্রি করে এককালীন অর্থ পাওয়া যাবে

আইলে রোপণোপযোগী বৃক্ষ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য

- দ্রুতবর্ধনশীল, বহুবিধ ব্যবহারোপযোগী, কম শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত
- ক্ষুদ্র, সরু, নরম, খাড়া ও সহজে পচনশীল পাতাবিশিষ্ট বৃক্ষ অগ্রাধিকারযোগ্য
- লিগিউম জাতীয় ও ভালো কপিসিং ক্ষমতা সম্পন্ন বৃক্ষ প্রজাতি উত্তম
- জ্বালালে আগুন ছিটকে পড়েনা ও ধোঁয়া কম হয় এরূপ প্রজাতির বৃক্ষ নির্বাচন করা যায়
- খরা বা বন্যায় বেঁচে থাকার ক্ষমতা সম্পন্ন বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত

আইলে রোপণোপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

১। প্লাবনমুক্ত ভূমির আইল

- গাঙ্গেয় উচ্চভূমি, সমতল গড় উচ্চভূমি, পাহাড়িভূমি এবং পাহাড়ের পাদদেশের সমতল উচ্চভূমি এর অন্তর্ভূক্ত

রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

- আকাশমনি, আম, ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল (তেলিকদম), কালাকড়ই, কাঁঠাল, কুরচি, কূল, খয়ের, খেজুর, গামার, গ্লিরিসিডিয়া, ঘোড়ানিম, চম্পা, জিগা (কচা, ভাদি), তাল, তেলশুর, তুন (পাইয়া, রঙ্গি), নারিকেল, নিম, পলাশ, পেয়ারা, বকফুল, বাবলা, বহাল, মান্দার, মেন্দা (পিপুলট্রি), মেহগনি, রাজকড়ই, শিমুল, বার্মাশিমুল, শিশু, শীলকড়ই, সোনালু, সুপারি, হাইব্রিড একাশিয়া ইত্যাদি।

২। স্বল্পকালীন অগভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল

পাহাড়ের পাদদেশের সমতলভূমি, নদীর খাড়া পাড়, গড় অঞ্চলের সমতল ভূমি এবং বসতভিটা এর অন্তর্ভূক্ত।

রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, কদম, কালোজাম, কালাকড়ই, খৈয়া-বাবলা (জিলাপী), খেজুর, জগডুমুর, জারুল, জিগা (কচা, ভাদি), তাল, তেলশুর, দেবদারু, মান্দার, মেন্দা (পিপুলটি), মেহগনি, রাজকড়ই, শিমুল, বার্মা শিমুল, শিশু, শীলকড়ই, সোনালু, সুপারি ইত্যাদি।

৩। জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত ভূমির আইল

উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের বাইরে অবস্থিত ভূমি এর অর্ন্তভূক্ত।

রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল (তেলিকদম), উরমই, কদম, কালোজাম, কাঁকড়া, কেওড়া, খৈয়া-বাবলা (জিলাপী), খেজুর, ছইলা, জারুল, ঝাউ, তাল, নারিকেল, পশুর, বাবলা, মান্দার, শীলকড়ই, সুপারি, সনবলই, হিজল ইত্যাদি।

৪। অগভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল

বর্ষায় সাময়িক ভাবে প্লাবিত হয় এরূপ সমতল ভূমি ও বাইদ কৃষি জমি এর অন্তর্ভূক্ত।

রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

কদম, কালাউজা, কাঁটামান্দার, গাব, জারুল, দেবদারু, পানি-বিয়াস, পিটালি, পিতরাজ, বরুন, হিজল ইত্যাদি। সাধারণত বর্ষায় প্লাবিত থাকে বলে এ সমস্ত ভূমিতে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় হলো এপ্রিল-মে অথবা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর।

৫। গভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল

মৌসুমী প্লাবনে এক মিটারের অধিক পানিতে প্লাবিত ঢাকা, সিলেট, ফরিদপুর, পাবনা, খুলনার বিল অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত।

রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

কদম, কালাউজা, কেরং (করমজা), জারুল, তমাল, পানিবিয়াস, পিটালি, বরুন, মান্দার, হিজল ইত্যাদি। বর্ষায় প্লাবিত থাকে বলে বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বিল অঞ্চলের আইলে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়।

প্রাসংগিক তথ্য

- গরু-ছাগলের উপদ্রব ও বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য আইলে দেড় থেকে দুই মিটার (মানুষ সমান) উচ্চতা বিশিষ্ট বেশি বয়সের চারা রোপণ করা উচিত।
- পূর্ব-পশ্চিমে সম্প্রসারিত আইলে অন্ততঃ দুই মিটার অন্তর অন্তর কম ডালপালা বিশিষ্ট বৃক্ষ প্রজাতি যেমন, সুপারি, খেজুর, তাল, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি রোপণ করা যেতে পারে। অধিক ডাল-পালা বিশিষ্ট প্রজাতি তিন থেকে সাড়ে তিন মিটার দূরত্বে রোপণ করা সঙ্গত।

- উত্তর-দক্ষিণে সম্প্রসারিত আইলে তিন থেকে চার মিটার অন্তর অন্তর গাছ রোপণ করা সঙ্গত। গাছ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে শীতকালে প্রয়োজন মত ডালপালা ছেটে দিন;
- আইলে রোপিত চারা দুই মিটার পরিমাণ লম্বা হওয়ার পর থেকে পার্শ্ব-শিকড় ছেটে দেওয়া ভাল। এ জন্য এক বছর পর পর গাছের গোড়া থেকে ৩০ সে. মি. দূরত্বে ৫০ সে. মি. গভীর করে পার্শ্ব-শিকড় ছেটে দিতে হবে। শিকড় ছাটাইয়ের পর মাটি দিয়ে গর্ত ভরে দিন;
- গভীরভাবে প্লাবিত বিল অঞ্চলের ভূমির আইলে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারা রোপণ করা বাঞ্চনীয়;
- জ্বালানী কাঠের জন্য ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া ইত্যাদি বৃক্ষ ৪-৫ বছর পর পর কেটে আহরণ করা সম্ভব। কর্তিত বৃক্ষের মোথা থেকে নতুন কুশি বা কপিস বের হয়ে নতুন কান্ডে রূপান্তরিত হবে। এরূপভাবে এসব প্রজাতির বৃক্ষ ৪-৫ বছর আবর্তে কপিস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একাধিকবার কাঠ আহরণ সম্ভব;
- বৃক্ষ ছাড়াও জমির আইলে উপযোগিতা অনুযায়ী পেপে, শিম ও অন্যান্য সবজি চাষ করা যায়।

মূলী বাঁশের ফল বা বীজ সংগ্রহ ও রোপণ পদ্ধতি

- মূলী বাঁশ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ ।
- প্রাকৃতিক নিয়মে মূলী বাঁশে ৪০-৫০ বছর পর পর ফুল আসে ।
- মূলী বাঁশের ব্যাপক এলাকা জুড়ে ফুল ও ফল ধরা ৪-৫ বছর স্থায়ী হয়। ১-২ বছর ব্যাপক হারে ফল হয় ।
- ব্যাপক হারে ফুল ও ফল হওয়ার পর মূলী বাঁশের ঝাড় সম্পূর্ন মরে যায় ।
- মূলী বাঁশের ফলটিই বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ।

ফল বা বীজের আকৃতি

- মূলীর ফল/বীজ দেখতে অনেকটা বড় আকারের পিয়াজের মতো, উপরের দিক একটু চিকন ও লম্বা ।
- পরিপক্ক বীজ শক্ত এবং সাধারণত হালকা বাদামি রঙের হয় ।
- ফুল আসার বছর গুলিতে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মূলী বাঁশে ফুল আসে। মে-জুন মাসে মূলী বাঁশের ফল পরিপক্ক হয় ।
- ফল পাকলে বাঁশটিকে হালকাভাবে নাড়া দিলে পরিপক্ক ফল মাটিতে পড়বে। ঝরে পড়া পাকা ফল সংগ্রহ করুন ।
- পরিপক্ক বীজ বা ফল এর আয়ুষ্কাল মাত্র ১-২ সপ্তাহ। সংগৃহীত ফল বা বীজ সরাসরি মাঠে রোপণ করুন ।

রোপণ পদ্ধতি

- ১২০-১৫০ সে:মি: দূরত্বে দাঁ বা কোঁদাল দিয়ে মাটিতে ১০-১৫ সে:মি: মাপের গর্ত করুন ।
- ফলটি আড়াআড়িভাবে গর্তে রোপণ করে সামান্য মাটি দিয়ে ঢেকে দিন ।

কোথায় লাগাবেন?

- পাহাড়ি ঢাল ও উপরিভাগে মূলী রোপণ করুন ।
- বসতবাড়ীর আশে-পাশে একটু উচুঁ জায়গায় এবং ছড়ার পাড়ে মূলী বাঁশের বীজ লাগান ।
- বর্ষার পানিতে ডুবে যায় এমন জায়গায় মূলীর বীজ লাগাবেন না ।
- অনুকূল পরিবেশ পেলে ৫-১০ দিনের মধ্যে বীজ থেকে চারা গজাবে ।

পরিচর্যা

- বীজ লাগানোর পর বৃষ্টি না হলে হালকা পানি দেওয়ার ব্যবস্থা নিন ।
- প্রয়োজনে রোপিত স্থানটিতে ঘেরার ব্যবস্থা করুন ।

চারার যত্ন বা আগাছা বাছাই

- মাঠে রোপিত বীজ ও কচি চারা ইঁদুর ও সজারু থেকে রক্ষা করুন ।
- কচি চারাকে গরু-ছাগলের উপদ্রব থেকে রক্ষা করুন ।
- কোন জায়গায় চারা মরে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে পূনরায় চারা রোপণ করুন ।
- পূর্ণাঙ্গ ঝাড়ে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর বাঁশ ঝাড়ের আগাছা পরিষ্কার করুন ।

বীজ থেকে গজানো বাঁশের একটি চারা ৪-৫ বছরে একটি পূর্ণাঙ্গ ঝাড়ে পরিণত হয়

বাঁশের কোঁড়ল একটি সুস্বাদু খাবার

বাঁশ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। দেশের বনাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে সর্বত্রই বাঁশ জন্মে থাকে। বাঁশ গরিবের কাঠ হিসেবেও পরিচিত। নির্মাণ কাজ, কৃষি উপকরণ, আসবাব পত্র তৈরি, কুলা, চালুন, ডালা, ঝুড়ি বানাতে ও কাগজ শিল্পের উপাদান হিসেবে বাঁশ ব্যবহার হয়ে আসছে। তাছাড়া বাঁশের কোঁড়ল বা বাঁশের কচি কান্ড (Bamboo shoot) একটি উপাদেয় খাবার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাঁশের কোঁড়ল খাবার টেবিলে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। একটি ঝাড় হতে যতগুলো কোঁড়ল বের হয়, তার সবগুলোই পূর্ণাঙ্গ বাঁশে রূপান্তরিত হয় না। তাই নির্মাণ ও শিল্পের কাঁচা মাল উৎপাদনের সাথে সাথে খাদ্য হিসেবে বাঁশের কোঁড়ল উৎপাদনের জন্য বাঁশের চাষ করা যায়। পরিকল্পিত উপায়ে বাঁশের কোঁড়ল আহরণ করলে বাঁশ উৎপাদনে কোন প্রকার ব্যাঘাত হয় না।

বাঁশের কোঁড়ল কি?

- বর্ষাকালে বাঁশের মোথা থেকে মাটি ভেদ করে শিং আকৃতির যে কচি কান্ড বের হয়, তাকে 'বাঁশের কোঁড়ল' (Bamboo shoot) বলে ।
- সাধারণতঃ বৃষ্টির শুরুতে, মে থেকে অক্টোবর মাসে বাঁশের কোঁড়ল জন্মে থাকে ।
- কোঁড়লের কচি অংশটি সবজি, সালাদ, আচার, স্যুপ ও অন্যান্য উপকরণ যথা- মাছ ও মাংসের সাথে রান্না করে খাওয়া যায় ।
- আমাদের দেশের সব বাঁশের কোঁড়লই সিদ্ধ করে সহজে খাওয়া যায়। তবে মূলী, ফারুয়া, প্যাঁচা ও ওরা বাঁশের কোঁড়ল অত্যন্ত সুস্বাদু ।
- খাদ্য হিসেবে বাঁশের কোঁড়ল অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, আঁশ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ এবং পর্যাপ্ত ভিটামিন এ, বি ও সি রয়েছে ।
- তাজা বাঁশের কোঁড়লে ৮৮-৯৩% পানি, ১.৫-৪% প্রোটিন, ০.২৫-০.৯৫% চর্বি, ০.৭৮-৫.৮৬% চিনি, ০.৬০-১.৩৪% সেলুলোজ এবং ১.১% খনিজ পদার্থ বিদ্যমান ।

বাঁশের ঝাড় থেকে কোঁড়ল আহরণ পদ্ধতি

- ঝাড়ে অপেক্ষাকৃত ঘনভাবে জন্মানো কোঁড়ল সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করতে হবে ।
- কোঁড়ল ১৫ হতে ২০ সে:মি: লম্বা হলে ধারালো ছুরি, কাচি বা কোদাল দিয়ে কেটে সংগ্রহ করতে হবে ।
- কোঁড়ল কাটার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঝাড়ের অন্য কোঁড়ল ও মুথা আঘাতপ্রাপ্ত না হয় ।

- সংগ্রহকৃত কোঁড়ল গরম পানিতে ৪৫ মিনিট সিদ্ধ করে কোঁড়লের বাইরের খোলস ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ছাড়িয়ে নিতে হবে।
- কচি মাংসল অংশগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে পানিতে এক থেকে দেড় ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে এবং গরম পানিতে সিদ্ধ করে পানি ফেলে দিয়ে নিরাপদে খাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা

- প্রতি বছর বিশ্বে ২৫০ হাজার টন টিনজাত বা প্যাকেটজাত বাঁশের কোঁড়লের চাহিদা রয়েছে, যা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে।

- চীন পৃথিবীর প্রায় ৩৭টি দেশে প্রতি বছর গড়ে ১৩৭ হাজার টন টিনজাত বা প্যাকেটজাত বাঁশের কোঁড়ল রপ্তানি করে থাকে।
- বাঁশের কোঁড়ল আমদানিতে জাপানের অবস্থান শীর্ষে। বিশ্ব বাজারের ৭০% বাঁশের কোঁড়ল জাপান একাই আমদানি করে থাকে এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান।

এছাড়াও কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর, জার্মানী, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও সুইডেন প্রভৃতি দেশেও বাঁশের কোঁড়লের প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

ভেষজ গুণাবলী

- বিভিন্ন গবেষণা তথ্য থেকে জানা যায়, বাঁশের কোঁড়ল দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা ও উচ্চ রক্তচাপ কমায় এবং ক্যান্সার রোধ করে।
- কোষ্ঠকাঠিন্য, হাঁপানি, ডায়াবেটিস, পেটে ও মাংসপেশিতে পানি জমা, তীব্র জ্বর, তাপদাহে বমি, রক্তপড়া, মৃগি, মুর্ছা যাওয়া, কফ, কাশি, জ্বর, প্রস্রাবে রক্ত, ফুঁসফুসে সংক্রমণ, পিত্থপাথর ইত্যাদি নিরাময়ে অবদান রাখে।
- চীনা চিকিৎসকগণ বাঁশ-কুড়লকে "স্বাস্থ্য রক্ষাকারি খাবারের রাজা" বলে অভিহিত করে থাকেন।

গুরুত্ব

- বাঁশের কোঁড়ল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের এবং সিলেট অঞ্চলের লোকদের একটি প্রিয় খাবার।
- বর্ষা মৌসুমে আদিবাসীরা খাদ্যের অভাবের সময় প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত বাঁশের কোঁড়ল সবজি হিসেবে খেয়ে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে থাকে।
- নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে সুপার মার্কেট ও চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে সরবরাহ করা যায়। কোঁড়লের চাষ করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

বাঁশের চাষ বাড়ান, ঝাড়ের যত্ন নিন ও কোঁড়ল উৎপাদন করে খাদ্য ঘাটতি পূরণে সহায়তা করুন

পাহাড়ি অঞ্চলের পণ্য ফুল ঝাড়ুর চাষাবাদ

ফুল ঝাড়ু

ফুল ঝাড়ু ঘাস পরিবারের (Poaceae) অর্ন্তভুক্ত লম্বা, গুচ্ছাকার এবং বহুবর্ষজীবি একটি উদ্ভিদ। এটির বৈজ্ঞানিক নাম *Thysanolaena latifolia*।

স্থানীয় নাম

স্থানভেদে এটি ফুল ঝাড়ু, ফুরইন (চট্রগ্রাম); বাটারি ফুরইন (কক্সবাজার); রেমা ঘাস (সিলেট); অর্জুন ফুল (মাটিরাঙ্গা); ছুরণধারা বা হুরণধারা (চাকমা ভাষা) নামে পরিচিত।

কোথায় জন্মে

এ উদ্ভিদটি রাঙ্গামাটি, খাগরাছড়ি, বান্দরবান, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট জেলার পাহাড়ি বনঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়।

পাহাড়ে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো ফুল ঝাড়ু গাছ

ফুল ঝাড়ুর জাত

জন্মস্থান ও রঙের ভিত্তিতে ফুল ঝাড়ু বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতির হয়ে থাকে। এ পণ্যটির চারটি জাত রয়েছে।

১. **মাইশ্যা জাতঃ** দেখতে অনেকটা কালচে রঙের। সরাসরি সূর্যালোকে জন্মে। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সংগ্রহ করা হয়।

২. **জাতি জাত বা জড়া ফুলঃ** এ জাতের মধ্যে লালচে, সাদা ও খয়েরি জাতি রয়েছে, যা দেখতে সবুজাভ। সাধারনতঃ ছায়ায় অধিক জন্মে থাকে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সংগ্রহ করতে হয়। এটি রপ্তানিযোগ্য।

৩. **হরিনা জাত বা বিচি ফুলঃ** দেখতে অনেকটা সবুজাভ ও লালচে ধরনের। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সংগ্রহ করতে হয়। এটি রপ্তানিযোগ্য।

৪. **বিনি ফুলঃ** বাঁশখালি ও নাইক্ষ্যংছড়ির পাহাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে এ জাতের ফুল ঝাড়ু পাওয়া যায় এটি দেখতে সোনালী রঙের। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সংগ্রহ করতে হয়। রপ্তানির ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়।

মইশ্যা (উপরে) ও জাতি ফুল (নীচে)

হরিণা জাত

বিনি ফুল

ফুল ঝাড়ু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত জনগণ ও উপজাতি নারীরা বিশেষ করে তঞ্চংগ্যা, ত্রিপুরা ও মারমারা পাহাড়ের প্রাকৃতিক বনাঞ্চল থেকে ফুল ঝাড়ু সংগ্রহ করে থাকে। সাধারণতঃ নভেম্বর-মার্চ মাসে ফুল ঝাড়ু সংগ্রহ

করতে হয়। চট্রগ্রাম ও পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলার বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও অন্যান্য পাহাড়ি এলাকা হতে সংগ্রহকারিগণ ফুল ঝাড়ু সংগ্রহ করে নৌকা, ট্রলার ও অন্যান্য যানবাহনযোগে এনে পাইকারি বাজারে বিক্রি করে থাকে। এখান থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীগণ ফুল ঝাড়ু ক্রয় করে ট্রাক ও ভ্যান যোগে বিভিন্ন খলায় (যেখানে ফুল ঝাড়ু শুকানো হয়) নিয়ে যায়। সেখানে ২৫-৩০ দিন ভালোভাবে প্রখর রোদে ওলট-পালট করে শুকানো হয়। উল্লেখ্য, রাঙ্গুনীয়া উপজেলায় ২০-২৫ টি খলা ছাড়াও অন্যান্য জায়গায়ও ফুল ঝাড়ুর খলা রয়েছে।

খোলায় শুকানো

বান্ডিল তৈরি ও বাজারজাতকরণ

ঘরে ব্যবহারের জন্য সাধারণতঃ ২০-২৫ টি কাঠি দিয়ে ফুল ঝাড়ুর একটি বান্ডিল তৈরি করা হয়। বান্ডিলটি সরু জালি বেত বা চিকন মইশনি লতা বা প্লাস্টিক রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে তৈরিকৃত ঝাড়ু দেশের বিভিন্ন জেলায় বাজারজাতকরণের জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে। প্রতি বান্ডিলের খুচরা মূল্য প্রায় ৫০-৬০ টাকা। উল্লেখ্য, চট্রগ্রাম শহরে ফুল ঝাড়ুর ৩-৪টি পাইকারি বাজার রয়েছে। প্রতি বছর বিভিন্ন মেলায় বিশেষ করে চট্রগ্রামে জব্বারের বলীখেলা বা বৈশাখি মেলায় ২-৩ দিনে ৫০-৬০টি অস্থায়ী দোকানে গড়ে ৫০-৬০ হাজার টাকা করে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার এ পণ্য বেচা-কেনা হয়ে থাকে। চট্রগ্রাম রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী এ পণ্যটি পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য, জাপান ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়ে থাকে এবং বিগত ২০০০-২০১১ সাল পর্যন্ত এ পণ্যটির রপ্তানি আয় বার্ষিক গড়ে ৩-৪ লক্ষ টাকা।

ঝাড়ু তৈরি

জব্বারের বলী খেলায় ফুল ঝাড়ু বিক্রয়

ব্যবহার

প্রধানতঃ ঘরের মেঝে পরিষ্কার করার কাজেই ফুল ঝাড়ু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া দালান কোঠার দেয়ালে চুনকামে ফুল ঝাড়ু দ্বারা তৈরি ব্রাশ ব্যবহৃত হয়। উপজাতিগন ফুল ঝাড়ু ঘরের ছাউনি, শুকনো ফুল ঝাড়ুর ডাটা জ্বালানী হিসেবে এবং ফুল ঝাড়ুর মূলের পাউডার মাউথ ওয়াশ ও ফোঁড়ায় প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করে। কঁচি ফুল ঝাড়ু হাতি ছাড়াও বানর, গরু, মহিষ ও ছাগলের খাদ্য হিসেবে খুবই প্রিয়।

বিলুপ্তির পথে ফুল ঝাড়ু

বাংলাদেশের অনেক লোক জীবিকা নির্বাহের জন্য ফুল ঝাড়ু পণ্যের উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও পাহাড়ি অঞ্চলে মাটি ক্ষয়রোধে ফুল ঝাড়ু বিশেষ ভূমিকা রাখে। কিন্তু দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনজ সম্পদের অপরিকল্পিত আহরণ, বনভুমি ধ্বংস, ভূমিধ্বস প্রভৃতি কারণে এ অর্থকরি উদ্ভিদটি বর্তমানে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হওয়ার পথে। অথচ দেশে-বিদেশে এ উদ্ভিদ থেকে তৈরিকৃত ঝাড়ুর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। পাহাড়ি এলাকার উপযুক্ত স্থানে চাষাবাদের মাধ্যমে ফুল ঝাড়ুকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি এটির উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন।

নার্সারি ও চারা উত্তোলন

নার্সারিতে চারা উত্তোলনের জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে পাহাড়ি অঞ্চল হতে ৪-৫ বছর বয়সী সুস্থ সবল ফুল ঝাড়ুর ঝাড় থেকে কোঁদাল দ্বারা মোথা বা রাইজোম (যাতে ১-২ টি সুপ্ত কুঁড়ি থাকে) সংগ্রহ করতে হবে। নার্সারিতে ১মি. x ৪মি. বালির বেড তৈরি করে প্রতিটি মোথা ১০ সে.মি. x ১০ সে.মি. দূরত্বে পুঁতে রোপণ করতঃ শুকনো খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টি না হলে প্রতিদিন প্রয়োজনমত ঝরনা দিয়ে পানি দিতে হবে ও আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। ৭-৮ দিনের মধ্যে রোপণকৃত মোথা হতে নতুন কুঁড়ি বের হতে শুরু করবে। এভাবে উত্তোলিত চারা ৩ মাস পর্যন্ত নার্সারিতে রেখে নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে।

চারা রোপণ ও উৎপাদন

জুন-জুলাই মাস ফুল ঝাড়ুর চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। পাহাড়ি অঞ্চলে ২মি. x ২মি. দূরত্বে ২০ সে.মি. x ২০ সে.মি x ১৫ সে.মি. গর্ত তৈরি করে ৩ মাস বয়সের চারা রোপণ করতে হবে। উক্ত দূরত্বে প্রতি হেক্টরে ২,৫০০-২,৬০০টি চারার প্রয়োজন হয়। গরু-ছাগল ও বন্য প্রাণীর হাত থেকে সৃজিত বাগান রক্ষা করতে হবে। প্রথম দুই বছরে ২-৩ বার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। প্রথম বছরে উৎপাদন কম হলেও দ্বিতীয় বছর থেকে ক্রমান্বয়ে ফুল ঝাড়ুর উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে ৪ বছরে প্রায় ৬,০০০-৭,০০০ টি ফুল ঝাড়ুর কাঠি উৎপাদন করা সম্ভব। প্রতি কাঠি ২.০০ টাকা হিসেবে যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১২,০০০-১৪,০০০ টাকা।

বাগান সৃজনের জন্য উপযুক্ত তিন মাস বয়সী চারা

উপসংহার

ফুল ঝাড়ু পাহাড়ি অঞ্চলের একটি লাভজনক ফসল। এটি পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে বিধায় এর চাষাবাদ অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া উক্ত অঞ্চলে কুটির শিল্প স্থাপন করে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

উত্তোলিত বাগান পরিচর্যা

সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ

কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ

কঞ্চি কলম সংগ্রহ

- কলম কাটার জন্য সুস্থ, সবল, অপেক্ষাকৃত মোটা আকৃতির এক বছরের কম বয়সের বাঁশ নির্বাচন করুন।
- বাঁশের গা ঘেঁষে আঙ্গুলের মত মোটা কঞ্চি হাত করাত দিয়ে কেটে সংগ্রহ করুন।
- কঞ্চির গোড়া হতে ৩-৫ গিট বা দেড় হাত লম্বা করে কঞ্চি কলম কাটুন।
- সংগৃহীত কঞ্চিগুলি নার্সারি বেডে লাগানোর পূর্ব পর্যন্ত ভেজা চট দিয়ে মুড়িয়ে রাখুন অথবা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন।
- কার্তিক হতে মাঘ (অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি) মাস বাদে সারা বছরই কঞ্চি কলম করা যায়। ফাল্গুন হতে আশ্বিন (ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি হতে সেপ্টেম্বর) মাস কঞ্চি কলম কাটার উপযুক্ত সময়।

বালির বেড তৈরি

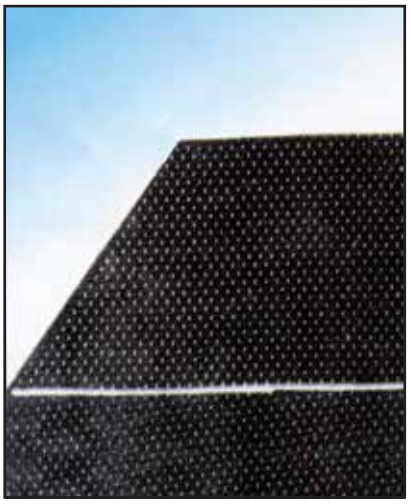

- ১২০ সে.মি. চওড়া এবং প্রয়োজন মত লম্বা বালির বেড তৈরি করুন।
- বালির বেডের উচ্চতা বা পুরুত্ব কমপক্ষে ২৫ সে.মি. হতে হবে।
- বালি সব রকমের আবর্জনা মুক্ত হতে হবে।
- বালির বেডের কিনার বাঁধার জন্য চারিদিক ইট বা তরজা ব্যবহার করুন অথবা সমতল মাটিতে বেডের আকৃতিতে মাটি কেটে আয়তকার ২৫ সে.মি. গভীরতার রক তৈরি করুন।
- মাটিতে কাটা বকটি বালি দিয়ে ভরে দিন। এটি একটি বেড হয়ে গেল।

বেডে কঞ্চি কলম রোপণ

- বালির বেডে কঞ্চিগুলি ৫-৭ সে.মি. দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে ৭-১২ সে.মি. গভীরে ভালভাবে বালি চেপে লাগান।
- বেডে কঞ্চি রোপণের পর হতে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত দিনে ২-৩ বার ঝরনা দিয়ে পানি সেচ দিন ।
- এ সময়ের মধ্যেই কঞ্চিতে নতুন শাখা-প্রশাখা ও পাতা গজিয়ে সম্পূর্ণ বেড সবুজ আকার ধারন করবে এবং কঞ্চি-কলমের গোড়ায় পর্যাপ্ত শিকড় গজাবে। তখন বেডে ধীরে ধীরে পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে দিন।

কলম স্থানান্তর ও রোপণ

- শিকড়যুক্ত কলম পলিথিন ব্যাগ বা উপযুক্ত পাত্রে স্থানান্তর করুন।
- স্থানান্তর করার জন্য ৩:১ অনুপাতে মাটি-গোবর মিশ্রণ ব্যবহার করুন।
- প্রতিটি ব্যাগে বা পাত্রে একটি করে শিকড় গজানো কঞ্চি কলম স্থানান্তর করুন ।
- ৭-১০ দিন কলমটি ছায়ায় রাখুন। এ সময় নিয়মিত দিনে একবার পানি দিন ।
- এরপর ব্যাগগুলি সারিবদ্ধ ভাবে বেডে সাজিয়ে রাখুন। মাঠে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাগের আগাছা বাছাই করুন ও পরিমিত পানি দিন ।
- বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ৪৫০ সে.মি. দূরত্বে ৪৫ সে.মি. গভীর ও ৩০ সে.মি. চওড়া গর্তে কঞ্চি কলম মাঠে লাগিয়ে দিন ।

চার বছরে একটি কঞ্চিকলম ঝাড়ে পরিণত হয়
ছয় বছর হলে আপনি ঝাড় হতে বাঁশ আহরন করতে পারবেন

বাঁশঝাড় ব্যবস্থাপনা

আপনার বাঁশঝাড় থেকে কি আশানুরূপ বাঁশ পাচ্ছেন না? আপনি কি বাঁশঝাড়ের উন্নত ব্যবস্থাপনা করে বাঁশ উৎপাদন বাড়াতে ও অধিক সবল বাঁশ পেতে ইচ্ছুক ?

খুব কম খরচে বাঁশঝাড় সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করে আপনি সহজেই অধিক লাভবান হতে পারেন।

বাঁশঝাড় ব্যবস্থাপনা কেন করবেন?

বাঁশঝাড় ব্যবস্থাপনা দ্বারা সুস্থ-সবল ও পুষ্ট বাঁশ উৎপাদন করে ভাল বাজার মূল্য পাওয়া যায়। পরিচর্যার ফলে ঝাড় থেকে বেশি সংখ্যক বাঁশ পাওয়া সম্ভব। এতে আপনি পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বাড়তি আয়ও করতে পারেন।

কিভাবে ব্যবস্থাপনা করবেন ?

পরিষ্কারকরণ

বাঁশঝাড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। ময়লা-আবর্জনা, পাতা, খুড়কুটো, পঁচা বা রোগাক্রান্ত বাঁশ, কঞ্চি ও কোঁড়ল ঝাড় থেকে নিয়মিতভাবে অপসারণ করতে হবে। চারা, কঞ্চি, মুথা বা অফসেট মাটিতে লাগানোর পর প্রথম ১-২ বছর চিকন ও সরু বাঁশ গজায়, যা মরে গিয়ে ঝাড়ে গাদিগাদি করে থাকে। গাদিগাদি করে থাকা চিকন ও মরা বাঁশ অপসারণ করে ফেলুন। প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে হালকা নিয়ন্ত্রিত আগুন দিয়ে ঝাড় এলাকার আবর্জনা ও শুকনো পাতা পুড়িয়ে দিন। এতে ঝাড়ে অনুকুল স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হবে যা প্রচুর নতুন কোঁড়ল মাটি থেকে বের হয়ে স্বাস্থ্যবান ঝাড় সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

নতুন মাটি প্রয়োগ

সাধারণত প্রতি বছর চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাঁশের কোঁড়ল গজায়। তাই প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ঝাড়ের গোড়ায় নতুন মাটি দেওয়া উচিত। এতে কোঁড়ল দ্রুত বেড়ে উঠবে ও সুস্থ বাঁশ পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত বা পুরাতন ঝাড়ের মাটি কখনো ব্যবহার করবেন না। এতে সুস্থ বাঁশঝাড়ে রোগ ছড়ানোর আশংকা থাকে।

সার প্রয়োগ

তিন বছর বয়সের (মাঝারি আকারের) ঝাড়ের গোড়ায় প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ১০০-১২৫ গ্রাম ইউরিয়া, সমপরিমাণ ফসফেট ও ৫০-৬৫ গ্রাম পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। ঝাড়ের চারিদিকে মাটি কুপিয়ে সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। সার প্রয়োগের পর বৃষ্টি না হলে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

পানি সেচ

খরা মৌসুমে চারা গাছ সুষ্ঠু ভাবে বৃদ্ধি পায় না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মারাও যায়। তাই প্রথম কয়েক বছর নতুন ঝাড়ে পরিমিত পানি সেচ দেওয়া প্রয়োজন। এক সপ্তাহে পর পর এক বা দুই কলস পানি বাঁশের চারার গোড়ায় ঢেলে দিয়ে খড় বা কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

পাতলাকরণ

বাঁশের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট জায়গা প্রয়োজন। অতিরিক্ত কঞ্চি বা পচা ও আঘাতপ্রাপ্ত বাঁশ নিয়মিত কাটা উচিত। ঝাড় থেকে বাঁশ এমনভাবে কাটতে হবে যেন একটি থেকে অন্যটি ১৫-২৫ সে.মি. দূরে থাকে।

আগাছা, মরা/পঁচা বাঁশ ও পুরোনো মোথা অপসারণ

আগাছাপূর্ণ স্থানে ঝাড় থেকে নতুন বাঁশ সহজে গজাতে পারে না অথবা সরু ও দূর্বল বাঁশ গজায়। কোন কোন সময় আগাছার চাপে চারা বাঁশ মারা যায়। তাই নতুন বাঁশঝাড় আগাছা মুক্ত রাখা উচিত। এছাড়া মাথাপঁচা রোগে আক্রান্ত মরা ও পঁচা বাঁশ ঝাড় থেকে সরিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার পুরাতন পরিত্যক্ত মোথা থেকে প্রকৃত পক্ষে কোন কোঁড়ল বের হয় না, বরং জায়গা নষ্ট করে বাধা সৃষ্টি করে। তাই বয়স্ক বাঁশঝাড়ের পুরাতন মোথা সাবল দিয়ে কেটে অপসারণ করলে বাঁশঝাড় আবার অনেকটা নতুন জীবন লাভ করে।

বাঁশ আহরণ

বাঁশের কোঁড়ল বের হওয়ার পর ৩ মাসের মধ্যে একটি বাঁশ পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তিন বছর বয়সে পরিপক্ক হয়। বর্ষায় যে কোঁড়ল বের হয় তা আশ্বিন-কার্তিক মাসের মধ্যে পূর্ণ উচ্চতা প্রাপ্ত হয়। ঝাড়ের ফলন ও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করলে একটি বাড়িতে কমপক্ষে তিনটি বাঁশঝাড় লাগাতে হবে। একটি বাঁশ পাকতে তিন বছর সময় লাগে। প্রতি বছরই বাঁশ ঝাড় থেকে পাকা বাঁশ আহরণ করতে হবে। তাহলে গুনগত দিক দিয়েও ভাল বাঁশ পাওয়া যাবে।

ঝাড় থেকে বাঁশ কাটা ও টেনে বের করার সময় যে সব বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত তা হলো

১) বাঁশে কঞ্চি বেশি থাকলে, গোড়ার দিকের কঞ্চিগুলো আগে কেটে ফেলুন। এতে ঝাড় থেকে কাটা বাঁশ টেনে বের করা সহজ হবে। কাজ শেষে কাটা কঞ্চি ও ডালপালা পরিস্কার করে দিন।

২) কোন নির্দিষ্ট ঝাড় থেকে তিন বছর বয়সের বাঁশ কাটুন। কখনও এক বছর বয়সের বাঁশ কাটা যাবে না। কারণ এ বাঁশ থেকে নতুন কোড়ল গজায়। একটি ঝাড়ে ১০টি বয়স্ক বাঁশ থাকলে ৫-৬টি বাঁশ কাটা যাবে। এমনভাবে বাঁশ সংগ্রহ করুন যেন থেকে যাওয়া বয়স্ক বাঁশ পুরো ঝাড়ে ছড়িয়ে থেকে ঝাড়টিকে ঝড়-বাদলের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

৩) প্রতিটি বাঁশ গোড়া থেকে কাটুন। মাটির কাছাকাছি গিটের ঠিক উপরে তেরছা করে কেটে বাঁশটিকে গোড়া থেকে আলাদা করুন। এতে বাঁশের অপচয় হয় না। এ ছাড়া ফেলে আসা গোড়ার অবশিষ্টাংশে বৃষ্টির পানি জমে পোকা-মাকড় বা ছত্রাকের আবাসস্থলে পরিণত হওয়ার সুযোগ থাকে না।

৪) বাঁশ গজানোর মৌসুমে (জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাস) কখনও বাঁশ কাটা উচিত নয়। এতে কাটার সময় সদ্যজাত বাঁশের কোঁড়ল ভেঙে যাওয়ার আশংকা থাকে। কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত বাঁশ কাটার উপযুক্ত সময়।

৫) যে বছর ঝাড়ে ফুল ও বীজ হয় সে বছর ঝাড়ের বাঁশ কাটা উচিত নয়। বাঁশে ফুল হলে ঝাড়ের সব বাঁশ মরে যায়। পাকা বীজ থেকে বাঁশের চারা তৈরি করে নতুন বাঁশ বাগান করা যায়। তাই বীজ সংগ্রহের পরে বাঁশ কেটে ফেলুন।

অধিক উৎপাদন পেতে হলে বাঁশ ঝাড়ের যত্ন নিন, বাঁশ রোপণ একবার আহরণ বার বার

তালের চারা উত্তোলন ও রোপণ পদ্ধতি

সূচনা

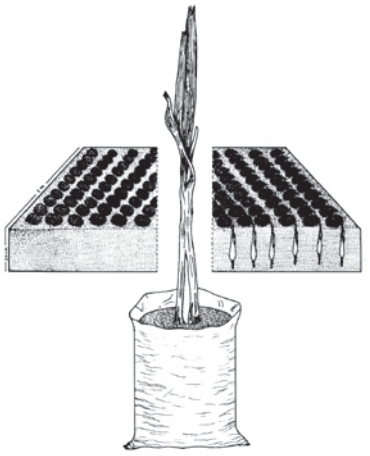

তালগাছ একক কান্ড বিশিষ্ট এদেশের অতি পরিচিত একটি বৃক্ষ। এর কান্ড সোজা ও লম্বা এবং মাথায় চমৎকার আকৃতির পাতাগুলো পাখার মতো গোলাকার। তালগাছ থেকে নানাভাবে লাভবান হওয়া যায়। তালগাছ ১০-১২ বছর বয়সে ফুল ও ফল দিয়ে থাকে। একটি পুরুষ অথবা স্ত্রী তালগাছের মঞ্জুরীদন্ড থেকে প্রতিবছর প্রায় দু'মাসব্যাপী প্রতিদিন ৮-১০ লিটার মিষ্টি রস আহরণ করা যায়। সদ্য আহরিত রস সুস্বাদু পানীয়। এ পানীয় বিক্রি করে সরাসরি লাভবান হওয়া যায়। প্রতি লিটার রস থেকে ২০০-২৫০ গ্রাম গুড় তৈরি করা যায়। এ গুড় থেকে মিছরি তৈরি করা হয় যা ঔষধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্ত্রী তালগাছের কাঁচা ও পাকা ফল বিক্রি করেও প্রচুর অর্থ পাওয়া হয়। পাকা তালের রস কনফেকশনারীতে শুকনো খাবার প্রস্তুতকরণের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব। তালগাছের পাতা ও আঁশ পাখা ও অন্যান্য কুটির শিল্পজাত দ্রব্য তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়। বয়স্ক তালগাছ থেকে উৎকৃষ্ট মানের কাঠ পাওয়া যায় যা গৃহ নির্মাণ ও সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ বৃক্ষ রোপণ করে সড়ক ও সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য বাড়ানো যায়। উপকূলীয় এলাকায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে সারিবদ্ধভাবে তালগাছ লাগালে ইহা ঝড়ো হওয়া ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা থেকে শস্য ও ঘরবাড়ি রক্ষা করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এবং এর শিকড় মাটির ক্ষয় রোধ করে।

ঘূর্ণিঝড় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় বর্তমানে যে সকল বৃক্ষ প্রজাতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার মধ্যে তালগাছ অন্যতম। সে মতে বন বিভাগ বাংলাদেশের উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্পে ও উপকূলীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুর্নবাসন প্রকল্পে একসারিতে অথবা বহুসারিতে বাঁধের পাশে তালগাছ লাগানোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

তালের বংশ বিস্তারের জন্য এর বীজ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন বৃক্ষায়নপ্রকল্পের আওতায় তালের বীজ সরাসরি মাটিতে লাগানো হয়ে থাকে। বীজ লাগানোর পর সাধারণত কোন প্রকার যত্ন নেয়া হয় না। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে বীজ গজিয়ে ধীরে ধীরে বৃক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু অনুপযুক্ত পরিবেশে বীজ গজাতে পারে না অথবা গজানোর পর তা নষ্ট হয়ে যায়। তাই তালের ব্যাপক চাষের জন্য চারা বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ কারণে তালের বীজ হতে চারা উৎপাদনের একটি সহজ ও সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে নার্সারিতে পলিব্যাগে গবেষণামূলকভাবে চারা উত্তোলন করে প্রত্যাশিত ফল লাভ করা যায়। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে তালের ব্যাপক বনায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। পলিব্যাগে তালের চারা উত্তোলনের এ পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো।

তালের ফল ও বীজ সংগ্রহ

আগস্ট মাস থেকে তাল পাকতে শুরু করে এবং অক্টোবর মাস পর্যন্ত পাকা তাল পাওয়া যায়। ফলের আকার, রং, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক তারতম্য দেখা যায়। একটি পাকা তাল আধা কেজি থেকে পাঁচ কেজি পর্যন্ত ওজনের হয়ে থাকে। তাল পানিতে ভিজিয়ে হাত দ্বারা কচলিয়ে আঁশ থেকে রস বের করা হয়। রস বের করার পর একটি বীজের ওজন একশ গ্রাম থেকে পাঁচশ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। তালসমৃদ্ধ এলাকা থেকে সদ্য সংগৃহীত পাকা তালের বীজ সংগ্রহ করাই উত্তম। তবে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নির্বাচিত মাতৃবৃক্ষ হতে তালের বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন করার সময় ফলের আকৃতি, ফলের রসে চিনির পরিমাণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, গাছে ফল ধরার সংখ্যা, কান্ডের আকৃতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। সংগৃহীত বীজ সতেজ অবস্থায় রাখতে হবে। সংগ্রহের পরপরই বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। বীজ শুকিয়ে গেলে তা থেকে চারা পাওয়া যাবে না। পরিপক্ষ তালের বীজের অংকুরোদগমের হার ৭০% এর উপর।

বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বেলেমাটি অথবা কম্পোস্ট দিয়ে বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে। বীজতলা ভালভাবে পরিচর্যা করার জন্য এক মিটার প্রস্থ ও দশ মিটার অথবা সুবিধাজনক দৈর্ঘ্যে তৈরি করা যেতে পারে। বীজতলা অবশ্যই বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

পাকা অথবা ইট বিছানো মেঝেতে বীজতলা তৈরি করতে হবে। এর পরিবর্তে মাটির উপর বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে তবে চারার শিকড় বীজতলার মাটিতে প্রবেশ না করার জন্য প্রথমেই পলিথিন শীট বিছিয়ে দেয়া যেতে পারে। এরপর ৩০-৪০ সে.মি. পুরু বেলেমাটি অথবা কম্পোস্ট দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। এরূপ একটি বীজতলায় প্রায় এক হাজারটি বীজ বপন করা যায়। সংগৃহীত বীজ পাশাপাশি রেখে বীজতলার উপর সাজাতে হবে এবং বীজের উপর ২-৩ সে.মি. পুরু করে আবার বালি বা কম্পোস্ট দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে।

বীজতলা সব সময় ভিজিয়ে রাখতে হবে। ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যেই বীজ অংকুরিত হতে শুরু করবে। বীজ অংকুরোদগমের সময় বীজপত্রের যে আবরণী বের হয়ে আসে তা দেখতে শিকড়ের মত কিন্তু আসলে তা শিকড় নয়। এই বীজপত্রের আবরণীর মাঝে ফাঁপা থাকে, অগ্রভাগে ভ্রূণ অবস্থান করে এবং টিউবের আকৃতিতে বৃদ্ধি পায়। একে জার্মটিউব বা বীজপত্রের আবরণী বলা হয়। হলদে রং-এর জার্মটিউবের অগ্রভাগে ভ্রূণ আবৃত থাকে এবং তা সাধারণত মাটির নীচের দিকে বৃদ্ধি পায়। জার্মটিউবের বৃদ্ধি ৬-৯ সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ হয় এবং ১৫-৪০ সে. মি. লম্বা হয়ে থাকে।

জার্মটিউব লম্বা হবার পরেই ভ্রূণের Coleoptile (ভ্রূণ কান্ডের আবরণী) এবং Coleorhiza (ভ্রূণ মূলের আবরণী)-এর বৃদ্ধি শুরু হয়। জার্মটিউবের মতো Coleoptile ১৫-৪০ সে.মি. লম্বা হয়ে থাকে। Coleorhiza ও শিকড় এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে এদের পৃথক করা কঠিন এবং বীজতলার নিচের মেঝেতে বাধা প্রাপ্ত হয়ে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। জার্মটিউব লম্বা হবার ১০-১৫ সপ্তাহের মধ্যে Coleoptile এর উপরে একটি পাতলা আবরণীতে পরিণত হয়। এ অবস্থায় চারায় কেবল ১টি Coleoptile ও ১টি শিকড় থাকে। চারার গোড়া ও শিকড়ের গা হতে ছোট ছোট অনু শিকড়ও গজাতে শুরু করে। Coleoptile এর বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হলে অর্থাৎ বীজের সাথে জার্মটিউবের সংযোগ স্থানে পঁচতে/শুকাতে আরম্ভ করলে চারা পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে।

চারা পলিব্যাগে স্থানান্তর ও নার্সারিতে পরিচর্যা

বীজতলায় উত্তোলিত চারা গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভরা পলিব্যাগে স্থানান্তর করে যত্ন নেয়া প্রয়োজন। পলিব্যাগে চারা উত্তোলনের সময় অবশ্যই খরচের বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। পলিব্যাগের সুবিধাজনক সাইজ ১৫ x ২৫ সে.মি. এবং পলিথিনের পুরুত্ব ০.০৬/০.০৭ মি.মি. হতে পারে। প্রতিটি পলিব্যাগের নিচের দিকে চার জোড়া ছিদ্র রাখতে হবে। পলিব্যাগে ভরার জন্য ১:৫ গোবর ও মাটির মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথমে বীজতলা খনন করে বেলেমাটি /কম্পোস্ট সরিয়ে চারা উন্মুক্ত করতে হবে। বীজ থেকে চারা আলাদা করার জন্য জার্মটিউবের উপরে অর্থাৎ বীজ সংলগ্ন চিকন, পঁচা/শুকনো স্থানে কাটতে হবে। যদি চারার শিকড় বেশি লম্বা হয় তবে প্রয়োজনে চারার সাথে ১০-১৫ সে.মি. শিকড় রেখে Secateur অথবা ধারালো চাকু দিয়ে কাটতে হবে।

প্রথমত

পলিব্যাগের ১/৩ অংশ গোবর মিশ্রিত মাটি ভরতে হবে। এরপর চারাটি পলিব্যাগের মাঝামাঝি এমনভাবে রাখতে হবে যেন চারার গোড়া প্রায় ৫ সে.মি. ব্যাগের মধ্যে থাকে। অতঃপর গোবর মিশ্রিত মাটি দিয়ে ব্যাগের বাকি অংশ ভরতে হবে (চিত্র-১)। পলিব্যাগে চারা স্থানান্তরের পরে অন্তত: ২-৩ সপ্তাহ আংশিক ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পলিব্যাগের চারা নার্সারিতে সাজিয়ে রাখতে হবে এবং পানি দিয়ে সবসময় পলিব্যাগের মাটি আর্দ্র রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। বীজতলায় থাকা অবস্থায় Coleoptile এর রং সাধারণত হলদে হয়ে থাকে তবে পলিব্যাগে স্থানান্তরের পর ধীরে ধীরে তা সবুজ রং ধারণ করে। কিছু দিনের মধ্যেই একটি মজবুত ঢেউ আকৃতির (ডগা) পাতা Coleoptile এর অগ্রভাগ ছিদ্র করে বের হবে এবং তারপর প্রথম পাতার পাশে নতুন একটি পাতা গজাবে। এভাবে জুন মাসের মধ্যে ৩০-৩৫ সে.মি. লম্বা দু'পাতার চারা পলিব্যাগে পাওয়া যাবে। পলিব্যাগের চারা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে এবং পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দমন করতে হবে।

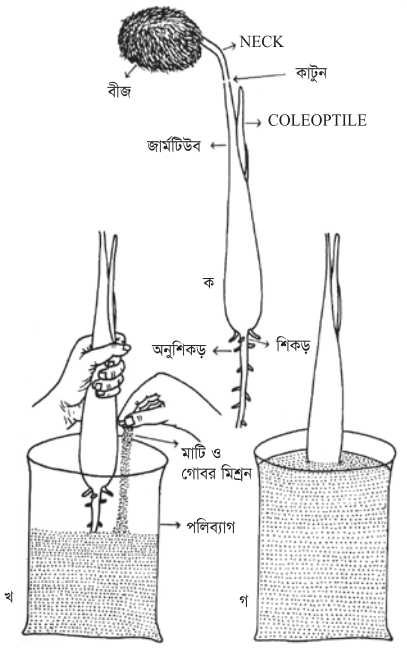

অঙ্কুরিত চারা পলিব্যাগের স্থানান্তর।

মাঠে চারা রোপণ

মৌসুমী বৃষ্টিপাত আরম্ভ হওয়ার পরপরই পলিব্যাগে উত্তোলিত চারা মাঠে রোপণ করা উচিত। তবে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে আর্দ্রতা থাকলে অথবা পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে চারা এপ্রিল-মে মাসে ও লাগানো যেতে পারে। যে সকল জমি বর্ষার সময় ১০-১৫ দিন সাময়িকভাবে প্লাবিত হয় সেখানে বর্ষার পরপরই পলিব্যাগের চারা লাগানো যেতে পারে। সমতল ভূমিতে অন্যান্য বৃক্ষ প্রজাতির পলিব্যাগের চারার মতোই এ চারা লাগাতে হবে। তবে রাস্তা অথবা বাঁধের ঢালুতে মাটির ক্ষয় কমানোর জন্য অগার দিয়ে গর্ত করে চারা লাগানো ভাল।

চারা লাগানোর নির্দিষ্ট স্থানে পলিব্যাগের আকৃতি অনুসারে গর্ত করতে হবে। পলিথিন ছিঁড়ে পলিব্যাগের মাটিসহ চারা গর্তে বসাতে হবে। গুড়ো মাটি দিয়ে গর্তের ফাঁক ভরাটসহ ভালভাবে চারার গোড়ার মাটি চেপে দিতে হবে। চারাগুলো আগাছামুক্ত রাখা ও গবাদি পশুর উপদ্রব থেকে রক্ষার ব্যবস্থা দিতে হবে। চারা রোপণের পর অন্তত প্রথম তিন বছর রোগ-বালাই ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। পলিব্যাগের চারা জমিতে লাগানোর পর সাধারণত মরে না তবে মাটি শুকিয়ে গেলে অথবা দীর্ঘদিন বন্যায় প্লাবিত অবস্থায় থাকলে মারা যেতে পারে। শিম জাতীয় বিরুৎ অথবা গুল্ম সাথীশস্য হিসাবে চাষ করে মাটির উর্বরতা বাড়িয়ে চারার যত্ন নেওয়া যেতে পারে।

উপসংহার

ব্যাপকভাবে তালের বনায়ন করার সময় উপযুক্ত মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন করে বীজ সংগ্রহ করে চারা উত্তোলন করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে তালের বনায়ন করলে ধাপে ধাপে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়। আর তালগাছ যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তা আমাদেরকে এর সৌন্দর্য্য দিয়ে মুগ্ধ করে রাখবে।

তালগাছ লাগান ও এর বহুমুখী সুফল ভোগ করুন

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উৎপাদন কৌশল

সূচনা

প্ল্যান্ট টিস্যু কালচার বা উদ্ভিদ কোষ আবাদ, উদ্ভিদের অঙ্গজ প্রজনন প্রক্রিয়ার একটি আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে উদ্ভিদ দেহের যে কোন সজীব ক্ষুদ্রাংশ যেমন মূলের শেষভাগ, কান্ডের শেষভাগ, পাতা, পর্ব, পর্বমধ্য অথবা যে কোন অংশের কলা বা টিস্যুকে পরীক্ষাগারে জীবানুমুক্ত পরিবেশে নির্দিষ্ট কৃত্রিম খাদ্য মিডিয়ামে আবাদ করা হয়। আবাদকৃত কলা বা টিস্যু থেকে অতি অল্প সময়ে, অল্প পরিসরে, উন্নতমানের প্রচুর সংখ্যক অনুচারা (plantlets) উৎপাদন করা যায়। প্ল্যান্ট টিস্যু কালচারের সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে করা হয়। ফলে সারা বছর আমরা উদ্ভিদের চারা তৈরি অব্যাহত রাখতে পারি। যেহেতু এ পদ্ধতিতে একটি নির্বাচিত মাতৃ উদ্ভিদ দেহের ক্ষুদ্রাংশ হতে চারা তৈরি করা হয় তাই নতুন উৎপন্ন চারার সহিত মাতৃ উদ্ভিদের চারিত্রিক গুণাগুণ অটুট থাকে।

টিস্যু কালচার চারার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. চারাগুলো রোগ জীবানু মুক্ত।

২. মাতৃ বাঁশের সাথে নতুন চারাগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অটুট থাকে।

৩. চারাগুলো পুনঃ সজীবতা গুন সম্পন্ন হয়।

৪. মাঠ পর্যায়ে চারাগুলো বেচে থাকার হার প্রায় শতকরা একশত ভাগ।

৫. প্রাথমিক পরিচর্যা সুষ্ঠভাবে করলে ৩-৪ বছরের মধ্যে প্রতিটি চারা পূর্ণাঙ্গ বাঁশঝাড়ে পরিণত হয়। মাঠ পর্যায়ে কোন কোন প্রজাতি এক বছরে সর্বোচ্চ ৩০-৩২ টি নতুন কান্ড বা কোঁড়ল দেয় যা প্রচলিত পদ্ধতির চারা থেকে কয়েক গুণ বেশী।

বাঁশের টিস্যু কালচার পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা

বাঁশ একটি দ্রুত বর্ধনশীল ঘাস প্রজাতির উদ্ভিদ। এটি বাংলাদেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাঁশের বংশ বৃদ্ধি অঙ্গজ প্রজনন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। কারন বাঁশের বীজ সহজে পাওয়া যায় না। গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা যায় বাঁশে ফুল আসতে অনেক সময় নেয়; প্রজাতি ভেদে ২০-৬০ বছর পর্যন্ত। তাছাড়া ফুল ফুটলেই সব প্রজাতির বাঁশে বীজ পাওয়া যায় না। তাই প্রচলিত অঙ্গজ প্রজনন প্রক্রিয়া যেমন রাইজোম বা মুথা পদ্ধতি, কাম কাটিং বা গিট কলম, দাবা কলম বা গ্রাউন্ড লেয়ারিং এবং কঞ্চি কলম পদ্ধতির মাধ্যমে বাঁশের চারা উৎপাদন করা হয়। উপরোক্ত পদ্ধতি গুলোর মধ্যে কেবলমাত্র কঞ্চি কলমের মাধ্যমে বাঁশের কয়েকটি প্রজাতির ব্যাপক ভিত্তিক চারা উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। তাই বাঁশের সকল প্রজাতির ব্যাপক ভিত্তিক চারা তৈরিতে টিস্যু কালচার পদ্ধতি সফল ভুমিকা রাখতে পারে।

বাঁশের টিস্যু কালচার বা কোষ-কলা আবাদ পদ্ধতি

টিস্যু কালচার বা কোষ-কলা আবাদ পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উৎপাদনে কঞ্চির পর্বমধ্যস্থ (internode) সতেজ সুপ্তকুঁড়ি (healthy nodal bud) ব্যবহার করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় -

- প্রথমে বাঁশ ঝাড় হতে কঞ্চির পর্বমধ্যস্থ সতেজ সুপ্তকুঁড়িসমেত কঞ্চি সংগ্রহ করা হয়,
- গবেষণাগারে কঞ্চির সতেজ সুপ্তকুঁড়িগুলোকে ১-১.৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটা হয়,
- কর্তিত অংশগুলোকে পর্যায়ক্রমে টুইন-২০, ২০% স্যাভলন, ডায়াথেন এম-৪৫, ০.১% মারকিউরিক ক্লোরাইড ($HgCl_2$) দ্বারা ধৌত করে জীবাণুমুক্ত করা হয়,

- সুপ্তকুঁড়ি পরিস্ফুটনের (sprouting) জন্য সাধারণভাবে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে আগারযুক্ত কৃত্রিম এমএস মিডিয়াম (MS বা Murashige & Skoog 1962 medium) বা কালচার মিডিয়াম এর প্রতি লিটার এর সাথে ০.৫ মি.গ্রা. - ১.০ মি.গ্রা. BAP (Benzyl Amino Purine) হরমোন ব্যবহার করা হয়,
- কালচার মিডিয়াম এ স্থাপিত সুপ্তকুঁড়িগুলোকে গ্রোথ রুমের (growth room) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে (তাপমাত্রা ২৭$^{\circ}$± ২$^{\circ}$ C, আর্দ্রতা ৫০-৯০%, আলোর তীব্রতা ২ কিলোলাক্স এবং ১৬ ঘন্টা আলো ও ৮ ঘন্টা অন্ধকার) গ্রোথ কেবিনেট (growth cabinet) এ রাখা হয়,
- ৭-১০ দিনের মধ্যে পরিস্ফুটিত সুপ্তকুঁড়িগুলো থেকে নতুন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিটপ (shoot) জন্মাতে শুরু করে,
- নতুন ক্ষুদ্র বিটপগুলোকে কেটে আলাদা করে অধিক সংখ্যক বিটপ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের হরমোন (BAP, Kinetin, Isopentyl adenine) মিশ্রিত সদ্য প্রস্তুতকৃত কৃত্রিম এমএস মিডিয়াম এ স্থাপন করা হয়। এভাবে প্রতিটি বিটপ হতে অধিক সংখ্যক বিটপ তৈরি করা সম্ভব,

চিত্র ঃ বাঁশের টিস্যু কালচার পদ্ধতি

- সদ্য জন্মানো নতুন প্রতিটি বিটপের গোড়ায় মূল গজানোর লক্ষ্যে অর্ধমাত্রার এমএস মিডিয়াম (৫০% এমএস মিডিয়াম + ৫০% পানি) এর সাথে সাধারণত তিন ধরনের হরমোন যেমনঃ IBA (Indole Butyric Acid), NAA (Naphtalene Acetic Acid) এবং IAA (Indole Acetic Acid) ব্যবহার করা হয়,
- প্রাপ্ত বিটপ গুলোকে মূল গজানোর হরমোন মিশ্রিত মিডিয়াতে পুনরায় স্থাপন করে পূর্বের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে রাখা হয়,
- পরবর্তীতে পর্যাপ্তসংখ্যক মূল গজানোর পর বাঁশের অনুচারাগুলোকে পরীক্ষাগারের বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশে ৭-১০ দিন পর্যন্ত হার্ডেনিং (hardening) করে নার্সারিতে বালির বেডে লাগানো হয়,
- নার্সারি বেড হতে ৩০দিন পর প্রতিটি বাঁশের অনুচারাকে মাটি ও গোবর (৩ঃ১) মিশ্রিত পলিব্যাগে স্থানান্তর করা হয়।
- অনুচারাগুলো কমপক্ষে ৬০-১৮০ দিন পর্যন্ত নার্সারিতে পরিচর্যা করা হয়। পরবর্তী বর্ষা মৌসুমে অনুচারাগুলো মাঠে লাগানোর উপযোগী হয়।

চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে ১৯৯৩ সন হতে বাঁশের বিভিন্ন প্রজাতির চারা উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা করে আসছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে এ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ১২ (বার) টি প্রজাতির বাঁশের চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
০১	বরাক বাঁশ	*Bambusa balcooa*
০২	কাঁটা বাঁশ	*B. bambos*
০৩	মাকলা বাঁশ	*B. nutans*
০৪	করজবা বাঁশ	*B. salarkhanii*
০৫	বাইজ্জা বাঁশ	*B. vulgaris*
০৬	স্বর্ণ বাঁশ	*B. vulgaris* var. *striata*
০৭	বেথুয়া বাঁশ	*B. cacharensis*
০৮	ব্রান্ডিসি বাঁশ	*Dendrocalamus brandisii*
০৯	ভুদুম বাঁশ	*D. giganteus*
১০	রেঙ্গুন বাঁশ	*Thyrsostachys oliveri*
১১	থাই বাঁশ	*T. siamensis*
১২	মূলি বাঁশ	*Melocanna baccifera*
১৩	ওরা বাঁশ	*Dendrocalamus longispathus*
১৪	এসপার বাঁশ	*Dendrocalamus asper*

বিগত ২০০৫ সনে দেশের ০৫টি স্থানে যেমন- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI), ইশ্বরদী পাবনা; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস (RU), রাজশাহী; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (JU) ক্যাম্পাস সাভার, ঢাকা; ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স (IFESCU), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এবং ফাইতং, লামা, বান্দরবান এ কৃষকের জমিতে বর্ণিত প্রজাতিসমূহের টিস্যুকালচারজাত চারা দ্বারা পরীক্ষামূলক বাগান উত্তোলন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রোপিত প্রতিটি চারা পরবর্তী ৪-৫ বৎসরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঝাড়ে পরিণত হয়। প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ ঝাড় হতে বছরে প্রায় ১৫-২০টি পর্যন্ত নতুন বাঁশ গজায়।

টিস্যু কালচার চারার বাঁশ বাগান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

টিস্যু কালচার চারার বাঁশ বাগান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বাঁশের চারা উৎপাদন সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে থাকে।